প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ২৯ ❖ ১৫-২১ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

কাথলিক মণ্ডলীতে কেন থাকব?

চিরঞ্জীব শেখ মুজিব

বাংলার মহারাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

মহাযাত্রার ৬ষ্ঠ বছর

চিত্রা থেক্‌লা কস্তা

জন্ম : ৬ অক্টোবর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া, নাগরী)
মৃত্যু : ৮ আগস্ট, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ (নিউইয়র্ক, আমেরিকা)

চিত্রা, দিনক্ষণ, মাস, বছর পেরিয়ে আবারও সবচেয়ে কষ্টদায়ক দিনটি ফিরে এলো। বড় অসময়েই চলে গেলি বোন। উন্নত দেশের কোন চিকিৎসাই তোর "মৃত্যু" আটকাতে পারেনি। কারণ এই সেরা ফুলটা যে ঈশ্বরের প্রয়োজন ছিল। আমরা ভুলতে পারিনি তোকে। এটা কি করে সম্ভব বল। তুই যে ছিলি আমাদের অনেক আদরের বোন। অনেক প্রিয় আলাদা একটি মানুষ। এ কয় বছরে তোদেরকে হারিয়ে আমরা বাকহীন হয়ে পড়েছি। আমরা বড়ই একা, অসহায়। আমাদের কষ্টগুলো কোন দিন শেষ হবে না। তুই অনেক কষ্ট করে মৃত্যুবরণ করেছিলি। ভাবলে বুকে একটা পাথর চাঁপা পড়ে আর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আমাদের জন্য প্রার্থনা করিস। আমরা যেন কষ্ট, যন্ত্রণা, ব্যাথাবিহীন মৃত্যু পাই। তুই ভাল থাকিস আমাদের প্রার্থনায়। ঈশ্বর যেন তোকে স্বর্গীয় দূত করে রাখেন এ প্রার্থনায় ভাল থাকিস। ♥♥♥♥♥

স্বর্গধামে যাত্রার দ্বিতীয় বছর

নিলু এথেল কস্তা

জন্ম : ১৭ জানুয়ারি, ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ (করান)
মৃত্যু : ১৭ আগস্ট, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ (তিরিয়া)
নাগরী, কালীগঞ্জ

মা,

আমাদের ছেড়ে তুমি ভাল থাকলেও আমরা ভাল নেই। মা, ছাড়া পুরো ঘরটাই অন্ধকার। মায়ের অভাব কোন কিছুতেই পূরণ হয় না। এত তাড়াতাড়ি মা তুমি চলে যাবে আমরা আগে বুঝতে পারিনি। এমন কি বয়স হয়েছিল মা যে, তোমার চলে যাওয়ার এত তাড়া ছিল। আমাদের কথা ভাবলে না মা। তোমার মৃত্যুর ৮০ দিনের দিন বাবার মৃত্যু। আমরা কি করে এত ব্যথা সইব মা। পরিবারের এই আপন মানুষগুলোকে একসাথে হারিয়ে আমরা কি করে ভাল থাকি মা। তোমারও এত কষ্টে মধ্যদিয়ে মৃত্যুবরণ করা সেই সময়গুলো ভুলা তো দূরের কথা বরং প্রতিনিয়ত আমরা তা স্মরণ করে কষ্ট পাচ্ছি। মা, তুমি আমাদের জন্য অনেক কষ্ট করেছ জীবনে। তাইতো মা আজ আমাদের অবস্থানে ভাল আছি শুধু তোমার জন্য। তুমি ছিলে কঠোর পরিশ্রমী, ধর্য্যশীলা, হিসাবী একজন মা। নিজের কষ্ট কখনো কাউকে বুঝতে দাও নি। তুমি বেঁচে থাকবে আমাদের সবার অনেক অনেক ভালবাসায়।

মা, তোমাকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ। প্রার্থনা করি ঈশ্বর যেন তোমাদের স্বর্গে স্থান দেন। আমেন।।

শোকাহতরা-
চন্দ্রা, চন্দন, চঞ্চল, চামিলি, ও চুমকী।

বিজ্ঞ/২১২/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ২৯
১৫ - ২১ আগস্ট, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
৩১ শ্রাবণ - ৬ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেটে

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visi: : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃকখ্রিষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মানব মুক্তির কাজে অংশগ্রহণ

১৫ আগস্ট মাগুলীক ও আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি ঘটনা স্মরণ করা হয়। প্রথমটি খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে অত্যন্ত আনন্দের। কেননা তারা বিশ্বাস করেন যিশুর মা মারীয়া সশরীরে স্বর্গে গিয়েছেন; যা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন বলে পরিচিত। দ্বিতীয়তটি অত্যন্ত কষ্টের ও বেদনার। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুদিবস। ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে কুচক্রীমহল নৃশংসভাবে হত্যা করে তাদেরকে। এই পৈশাচিক কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাংলার সূর্যকে স্তিমিত করে বাংলাকে আবার পরাধীনতার শিকলে বন্দী করা। বর্বরোচিত এই ঘৃণ্য কাজে ইন্ধন যুগিয়ে স্বার্থবাদী দেশী-বিদেশী মহল তাদের কলুষিত মানসিকতার প্রকাশ করেছে। তারা মনে করেছিল এ পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড ঘটানোর মধ্যদিয়ে সবকিছুর শেষ হবে। কিন্তু বাংলার মানুষ এ ঘৃণ্যতা মেনে নেয়নি। শুধু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকেই নয় তাঁর নামকেও হত্যা করতে চেয়েছিল ষড়যন্ত্রকারীরা। ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অনেক ছলা-কলা করা হয়েছে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। কেননা সত্য তার আপন সময়ে বেরিয়ে আসবেই।

সত্য ও জীবনের উৎস যিশু এ জগতে এসেছিলেন পাপ ও মন্দতার দাসত্ব থেকে জগতের মানুষকে মুক্তি দিতে। তাঁর এই মুক্তিদায় কাজে একনিষ্ঠ ভক্ত ও সমর্থক তাঁর মা মারীয়া। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে যিশুর জীবনের সর্বাবস্থায় উপস্থিত থেকে কুমারী মারীয়া স্বর্গের অধিকার অর্জন করেন। স্বর্গের বিশেষ আসন পাবার আগে কুমারী মারীয়াকে পেতে হয়েছে নানাবিধ মানসিক ও শারীরিক কষ্ট। দেখতে হয়েছে সন্তানের ক্রুশ মৃত্যুর দৃশ্য। তবুও ঈশ্বরের ইচ্ছা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। তিনি আজীবন আত্মোৎসর্গের পথে জীবন-যাপন করেছেন। তাই জীবনের শেষে ঈশ্বর তাঁকে মহৎ দানে ধন্য করে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে গেলেন। মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন আমাদের মরদেহের স্বর্গপ্রাপ্তির নিশ্চিত আশা প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা স্বর্গে উন্নীত হতে পারব যদি আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা মেনে চলি। ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করতে গিয়ে আমাদেরকে প্রতিদিন সংগ্রাম করতে হয়। নিজেদের অনেক দুর্বলতা যথা; স্বার্থপরতা, ভোগ-বিলাসিতা, আরাম-আয়েস, রাগ-ঈর্ষা, রেষারেষি, প্রভুত্ব, অহংকার প্রভৃতি ত্যাগ করতে হয়। এ দুর্বলতাগুলো ত্যাগ করার মধ্যদিয়ে আমরা মুক্ত ও স্বাধীন মানুষ হই।

মুক্ত ও স্বাধীন থাকা মানুষের গভীর একটি আকাঙ্খা। পাকিস্তানের শোষণ ও নিষ্পেষণে বাংলার মানুষও ব্যাকুল হয়ে প্রত্যাশা করতো একজন নেতার যিনি স্বাধীনতা আনয়নে নেতৃত্ব দিবেন। আর ঈশ্বরই সুনির্দিষ্ট সময়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে এ বাংলার বুকে প্রেরণ করেছেন যাতে করে তিনি বাংলার মানুষের অধিকার-স্বাধিকার আনয়নে নেতৃত্ব দিতে পারেন। মা মারীয়ার মতো বঙ্গবন্ধুও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছাতে হ্যাঁ বলেছেন। তাই শত্রু পক্ষদের শত বাঁধার মধ্যেও জীবন বাজি রেখে তিনি স্বাধীনতা আনয়নে সম্ভবপর সকল কিছু করেছেন। কৃচ্ছতাসাধন ও সহজ-সরল জীবন-যাপন করার মধ্যদিয়ে বঙ্গবন্ধু বাংলার দরিদ্র মানুষের সাথে একাত্ম থাকতে চেয়েছেন। ভৌগলিক স্বাধীনতার সাথে সাথে বাংলার মানুষকে অর্থনৈতিক ও মানসিক মুক্তি দান করার জন্যও নানামুখী কাজকর্ম করেন মুজিব সরকার। রাষ্ট্র পরিচালনায় তিনি প্রাধান্যে রাখতেন গণমঙ্গল। সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তা করতেন বলে মানুষের নেতিবাচক দিকটি নিয়ে বেশি চিন্তা করতেন না। তিনি নিজে দেশপ্রেম ও মানবপ্রেমে নিমজ্জিত ছিলেন বলে দেশের মানুষের প্রতি তাঁর ছিল অগাধ ভালোবাসা ও বিশ্বাস। মানুষকে অতি আপন করে নেয়ার ফলে শেখ মুজিবুর রহমান ভাবতে পারেননি কেউ তাঁর ক্ষতি করবে বা কেউ স্বাধীনতার অপব্যবহার করবে।

স্বাধীনতা ও মুক্তি অর্জন যেমনি কঠিন তেমনি তা যথার্থভাবে চর্চা করাও কঠিন। তাইতো মুক্ত স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার স্থপতিকেও নৃশংসতার শিকার হতে হয়। রাজনৈতিক ও ভৌগলিক স্বাধীনতা আসলেও বাংলার অনেক মানুষ এখনো স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ মানসিকতা, সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় গোঁড়ামী ইত্যাদি অপ-মূল্যবোধগুলো থেকে মুক্ত হতে পারেনি। প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ নিতে হলে আমাদের প্রত্যেককে উপরোক্ত বিবিধ অপমূল্যবোধগুলো থেকে মুক্ত হতে হবে। নিজে মুক্ত হয়ে অন্যকেও মুক্ত হতে সহায়তা করে মুক্তির কাজে আমরা সকলেই অংশ নিতে পারি। †

আহা, সুখী সেই জন যে বিশ্বাস করেছে ! কারু প্রভু দ্বারা তাকে যা বলা হয়েছে, তা সিদ্ধিলাভ করবে। *(লুক ১:৪৫)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

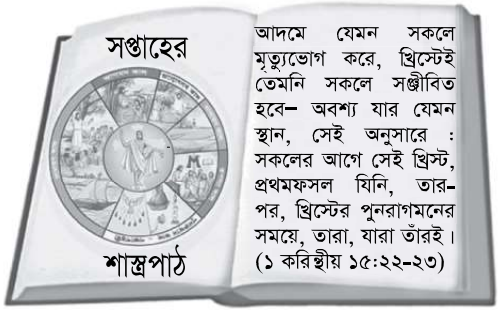

আদমে যেমন সকলে মৃত্যুভোগ করে, খ্রিস্টেই তেমনি সকলে সঞ্জীবিত হবে– অবশ্য যার যেমন স্থান, সেই অনুসারে : সকলের আগে সেই খ্রিস্ট, প্রথমফসল যিনি, তার-পর, খ্রিস্টের পুনরাগমনের সময়ে, তারা, যারা তাঁরই। (১ করিন্থীয় ১৫:২২-২৩)

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৫ - ২১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

১৫ আগস্ট, রবিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন- মহাপর্ব
প্রত্যাদেশ ১১: ১৯; ১২: ১-৬, ১০, সাম ৪৫: ১০-১২, ১৫খ-১৬, ১ করি ১৫: ২০-২৬, লুক ১: ৩৯-৫৬

১৬ আগস্ট, সোমবার
বিচারক ২: ১১-১৯, সাম ১০৬: ৩৪-৩৭, ৩৯-৪০, ৪৩কখ, ৪৪, মথি ১৯: ১৬-২২

১৭ আগস্ট, মঙ্গলবার
বিচারক ৬: ১১-২৪ক, সাম ৮৫: ৮, ১০-১৩, মথি ১৯: ২৩-৩০

১৮ আগস্ট, বুধবার
বিচারক ৯: ৬-১৫, সাম ২১: ১-৬, মথি ২০: ১-১৬ক

১৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
বিচারক ১১: ২৯-৩৯ক, সাম ৪০: ৪, ৬-৯, মথি ২২: ১-১৪

২০ আগস্ট, শুক্রবার
সাধু বার্ণার্ড, মঠাধ্যক্ষ ও আচার্য-এর স্মরণ দিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
পরম গীত ৮: ৬-৭, সাম ১৪৮: ১-২, ১১-১৪, লুক ৬: ১৭, ২০-২৬
অথবা: রুথ ১: ১, ৩-৬, ১৪খ-১৬, ২২, সাম ১৪৬: ৫-৬খ, ৭-১০ক, মথি ২২: ৩৪-৪০

২১ আগস্ট, শনিবার
সাধু দশম পিউস, পোপ-এর স্মরণ দিবস
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
১ থেসা ২: ২খ-৮, সাম ৮৯: ১-৪, ২০-২১, ২৪, ২৬, যোহন ২১: ১৫-১৭
অথবা: রুথ ২: ১-৩, ৮-১১, ৪: ১৩-১৭, সাম ১২৮: ১-৫, মথি ২৩: ১-১২

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৫ আগস্ট, রবিবার
+ ১৯৯৮ সিস্টার ডামিয়েন বোসার সিএসসি

১৬ আগস্ট, সোমবার
+ ১৯৩৮ সিস্টার এম. রোজ বার্ণার্ড গেহরিং সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৩৯ ব্রাদার ওয়াল্টার জে. রেমলিন্ডার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭১ ফাদার যাকোব এ. কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৮৬ সিস্টার স্ট্যানিসলাস এমসি

১৭ আগস্ট, মঙ্গলবার
+ ১৯৮৬ সিস্টার এমি সেন্ট জেরমেইন সিএসসি
+ ১৯৯৯ ব্রাদার আকুইলা লেনিয়েল সিএসসি (চট্টগ্রাম)

১৮ আগস্ট, বুধবার
+ ১৯১১ সিস্টার আন্দ্রে বার্ণার্ড এসএসএমআই (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফাদার ম্যাকমোহন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৮ ফাদার দান্তে বেরতলি এসএক্স (খুলনা)
+ ২০০২ সিস্টার মেরী ইগ্নেসিয়াস এসএমআরএ (ঢাকা)

১৯ আগস্ট, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৩ সিস্টার জুডি সোল এসএমএসএম
+ ১৯৮৪ ব্রাদার ডনাল্ড ডব্লিউ স্মিটস সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রাদার চার্লস বিবৌ সিএসসি (ঢাকা)

২০ আগস্ট, শুক্রবার
+ ১৯৫১ ফাদার জ্যাঁ-মারী ফ্লারী সিএসসি (ঢাকা)

পরিত্রাণ-ব্যবস্থায় দৃঢ়ীকরণ

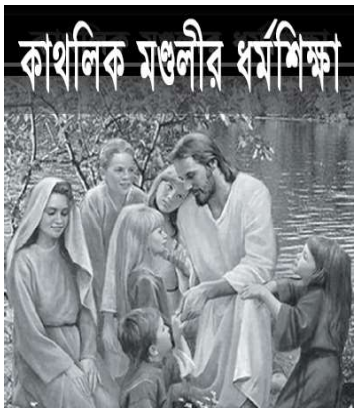

১২৯১ : রোমীয় মণ্ডলীর একটি প্রথা পাশ্চাত্যের প্রচলিত রীতি- বিকাশে সহায়তা করেছে: দীক্ষাস্নানের পর পবিত্র অভিষেক-তেল দ্বারা দু'বার অভিলেপন করা হত। দীক্ষাজলে স্নানের পর দীক্ষাপ্রার্থীকে একজন যাজক প্রথম অভিলেপন করতেন; আর বিশপ নবদীক্ষিতদের কপালে দ্বিতীয় অভিলেপন দ্বারা তা সম্পন্ন করতেন। যাজক কর্তৃক পবিত্র অভিষেক- তেলের দ্বারা প্রথম অভিলেপন দীক্ষাস্নান অনুষ্ঠান-রীতির সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে; এর তাৎপর্য হচ্ছে, খ্রিস্টের প্রাবক্তিক, যাজকীয় এবং রাজকীয় কর্মদায়িত্বে নবদীক্ষাস্নাত ব্যক্তির অংশগ্রহণ। বয়স্কদের দীক্ষাস্নান প্রদান করা হলে, দীক্ষাস্নানের পরে শুধু একটি অভিলেপনেরই রীতি রয়েছে, তা হলো দৃঢ়ীকরণ সংস্কারে অভিলেপন।

১২৯২ : প্রাচ্য মণ্ডলীসমূহের প্রচলিত রীতি খ্রিস্টীয় জীবনে প্রবেশের ঐক্যের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। লাতিন মণ্ডলীর প্রচলন বিশপের সঙ্গে নতুন খ্রিস্টবিশ্বসীর সংযোগ অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে, কারণ বিশপ হলেন তাঁর মণ্ডলীর একতা, সার্বজনীনতা ও প্রৈরিতিকতার রক্ষক ও সেবক, এবং এভাবে খ্রিস্টের মণ্ডলীর প্রৈরিতিক উৎপত্তির সঙ্গে সংযুক্ত।

দৃঢ়ীকরণের চিহ্নসমূহ ও অনুষ্ঠান-রীতি

১২৯৩: দৃঢ়ীকরণ অনুষ্ঠান-রীতির আলোচনায় অভিলেপনের চিহ্ন, এবং তার তাৎপর্য ও মুদ্রাঙ্কন বিবেচনা করা সমীচীন: এটি হচ্ছে একটি আধ্যাত্মিক মদ্রাঙ্কন।

অভিলেপন, বাইবেল ও অন্যান্য প্রাচীন প্রতীকত্বে অভিলেপন খুবই অর্থ সমৃদ্ধ: তেল হচ্ছে প্রাচুর্য ও আনন্দের চিহ্ন, তেল পরিশুদ্ধকরে (স্নানের আগে ও পরে তেল লেপন) এবং সতেজ করে (খেলোয়াড় ও মল্লযোদ্ধাদের তেল লেপন); তেল নিরাময়ের চিহ্ন, যেহেতু তা আঘাত ও ক্ষতের উপশম করে; এবং তেল সৌন্দর্য, স্বাস্থ্য ও শক্তিতে উজ্জল করে॥

মা মারীয়ার স্বর্গোন্নয়ন

দুর্জয় মিখায়েল দিও

ঈশ্বর জননী অমলোদ্ভবা মারীয়া স্বর্গে উন্নীত হন, এই ধর্মতত্ত্ব বহু শতক ধরে খ্রিস্টানগণ মেনে আসছে। খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের এই বিশ্বাসীয় তত্ত্ব যা ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে পোপ দ্বাদশ পিউস অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা করেন। ধন্যা কুমারী মারীয়া সকল মানুষের মধ্যে প্রথম উপভোগ করেন তাঁর পুত্র যিশুর আত্মোৎস্বর্গের পূর্ণতম ফল।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করেন যিশুর মত তাঁর মা মারীয়া ও ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহে সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করেছেন। যিশু সশরীরে স্বর্গে প্রবেশ করেছেন এবং তার মা মারীয়াও স্বর্গে প্রবেশ করবে তা কতই না যৌক্তিক। কেননা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করার মাধ্যমে, কুমারী মারীয়া স্বর্গের অধিকারটি আদায় করেছে। স্বর্গের এই বিশেষ আসন পাবার আগে মা মারীয়াকে কত শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রনা সইতে হয়েছে, এই কষ্ট পাওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি সব কিছু সহ্য করেছেন, জীবনের সময়গুলো তিনি আত্মোৎস্বর্গের মাধ্যমে যাপিত করেছেন, এমনকি পুত্রের ক্রুশীয় মৃত্যু দৃশ্য তিনি দেখেছেন যার ফলে ঈশ্বর তাকে তার শেষ জীবনে মহৎ দানে ধন্য করে সশরীরে স্বর্গে উন্নীত করলেন।

ঈশ্বর পুত্রের জননী চির নির্মলা কুমারী মারীয়া সশরীরে স্বর্গে উন্নীত হয়ে পুত্রের পরম গৌরবের সহভাগি হয়েছেন। পিতা ঈশ্বর তার পুত্র যিশুর জননী হবার পরম সম্মানে মারীয়াকে শোভিত করেছেন। তাই প্রত্যাদেশ গ্রন্থে দেখি, স্বর্গে দেখা দিল এক, মহা নিদর্শন সূর্য পরিমণ্ডিতা এক নারী, চন্দ্র তার পদতলে, তার শিরে দ্বাদশ তারার মুকুট" *(প্রত্যা. ১২:১)*।

দূতসংবাদকালে মারীয়া তার বিশ্বস্ততায় সম্মতি দেয়ার মুহূর্ত থেকে ক্রুশের তলায় স্থির থেকেছেন। স্বর্গে উন্নীতা হয়ে তিনি মুক্তিদায়ী কাজ পরিত্যাগ করেনি। প্রার্থনা ও অনুনয়ের মাধ্যমে শ্বাসত জীবনের উন্নয়নের জন্য আমাদের জন্য সবর্দা কাজ করে যাচ্ছেন। বিপদ এবং সমস্যায় জর্জরিত এই জগতের সন্তানদের তিনি মাতৃত্বের ভালবাসা দিয়ে যত্ন নিচ্ছেন। স্বর্গে আজ ঈশ্বর জননী মারীয়া দেহ ও আত্মায় গৌরবের অধিকারী।

"তারা সবাই বিশ্বসী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে এবং যিশুর মাতা মারীয়া ও তার ভাইদের সঙ্গে একমন হয়ে প্রার্থনায় রত" *(শিষ্য.১:১৪)*। নিষ্কলঙ্কা কুমারী যিনি আদিপাপের সকল কালিমা থেকে মুক্ত ছিলেন, তিনি জীবনের সমস্ত কিছুর বাণীরূপে প্রভুর প্রভু অনুগত থাকতে পারেন *(প্রত্যা.১৯:১৬)*।

স্বর্গদূত গাব্রিয়েল মারীয়াকে প্রসাদপূর্ণা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং প্রভু যে তার নিত্য সহায় আছেন তাও জানিয়ে দিয়েছিলেন *(লুক-১:২৮)*। মারীয়া স্বর্গীয় মাতৃত্বের অধিকারী। তিনি সত্যিকার ভাবে স্বর্গীয়া মা তার নিষ্কলঙ্ক দেহ ও আত্মা এবং যিনি স্বশরীরে স্বর্গে গমন করে পরিপূর্ণতায় ভূষিত হলেন, তা স্বর্গোন্নয়নের পর্বের মাধ্যমে বুঝা যায়। মূলত ভক্তি আনে আমাদের বিশ্বাস থেকে।

সৃষ্টির প্রথম নারী হবা, যার মধ্যদিয়ে শয়তান জগতে পাপ এনেছিলেন। মা মারীয়া হলেন এ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ নারী যার দ্বারা সেই শয়তানকে পরাস্ত্র করে জগতে সকল নারীত্ব, তথা জগতের সকল মানুষের পুণ্যকে আবার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই তাকে স্বর্গে উন্নীতা করে গৌরবের উজ্জ্বল মুকুটে শোভিতা করেছেন ঈশ্বর যিনি এই জগতের প্রভু।

মা মারীয়া সম্পূর্ণভাবে পাপ বর্জিতা আদর্শ মা। মা মারীয়া মাতৃগর্ভ থেকেই পাপ বর্জিতা নারী ছিলেন। কোন প্রকার দোষ ত্রুটি, পাপ অপরাধ মারীয়ার দেহ ও আত্মা কলঙ্কিত করতে পারেনি। কারণ তিনি হবেন মহান ঈশ্বরের মা, যিশুর মা তথা বিশ্বমণ্ডলীর তথা ঐশজনগণের মা।

মা মারীয়া নিষ্কলঙ্কা ছিলেন বলেই স্বশরীরে তাকে স্বর্গে তুলে নেওয়া হলো। স্বর্গের রাণী এবং বিশ্বের ঐশ জনগণের অধিকারিনী মা তিনি। স্বর্গের গৌরবের মুকুট এবং ঈশ্বরের মা তথা বিশ্ব জনমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক মা তিনি। স্বর্গোন্নয়নের মধ্যদিয়ে পরিত্রাণের পরিপূর্ণতা অর্জন করেছেন। তিনি হলেন পরিত্রাণের প্রথম ফসল।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে মণ্ডলীর পিতৃবর্গগণ মারীয়াকে দ্বিতীয় হবা বলে আখ্যায়িত করেছেন। আদি পিতামাতা আদমও হবার পাপের কারণে মৃত্যু এসেছিল, কিন্তু মারীয়া দ্বিতীয় হবা হয়ে যিশুর সঙ্গে থেকে মানুষের পরিত্রাণের ফলভাগী হলেন। মর্তে ও জীবনকালেও মারীয়া সর্বদাই যিশুর সঙ্গে থেকে পরিত্রাণের সহায়ক রূপে কাজ করেছেন।

১. মারীয়া যিশুকে নয় মাস ধরে গর্ভে ধারন করে যাঁর সহায় ছিলেন।
২. মা মারীয়া যিশকে জন্ম দিলেন অসীম, ভালবাসা, যত্ন ও সোহাগে দুঃখে কষ্টে যিশুকে লালন-পালন করলেন।
৩. মারীয়া যোসেফসহ যিশুকে নিয়ে মিশরে গেলেন, আবার নাজারেথে ফিরে এলেন ৩০ বছর ধরে যিশুর জন্য চিন্তা প্রকাশ করলেন।

খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের ও আশা আছে যে আমরা ও মা মারীয়ার মতো স্বর্গে উন্নীত হব। কিন্তু স্বর্গে উন্নীত হতে হলে ঈশ্বরের বাধ্য থাকতে হবে, থাকতে হবে নিষ্পাপ, থাকতে হবে আত্মোৎস্বর্গের মনোভাব, হতে হবে বাধ্য যে ভাবে মা মারীয়া ঈশ্বরের বাধ্য থাকার মধ্যদিয়ে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে যা মা মারীয়ার মধ্যে আমরা দেখতে পায়, খ্রিস্ট বিশ্বাসী হিসেবে আমরা কি পারব? মা মারীয়ার মধ্যে এইসব গুনগুলো ছিল বলে ঈশ্বর তাকে তার সর্বোচ্চ পুরস্কার প্রদান করেছেন, কেননা তিনি ঈশ্বরের বাধ্য থাকার মাধ্যমে তিনি গুনটি প্রকাশ করেছেন, স্বর্গোন্নয়নের অংশীদার হয়েছেন, এবং ঈশ্বর তাকে স্বশরীরে স্বর্গে উন্নীত করেছেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ
১. দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার দলিলসমূহ।
২. পবিত্র বাইবেল।
৩. প্রার্থনার বিতানসমূহ॥

বাংলার মহারাষ্ট্রনায়ক বঙ্গবন্ধু

প্রত্যয় কস্তা

বাংলার বিখ্যাত কবি অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই বলেছেন - যতদিন রবে পদ্মা, মেঘনা, গৌরি, যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান। একমাত্র বাঙালি যিনি বাংলাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। নিজের হাতে বাংলাকে গড়তে চেয়েছিলেন। বাংলাকে করতে চেয়েছিলেন সোনার বাংলা। সেই চিন্তাধারায় কাজ করেছিলেন। বাংলার দুঃসময়ে তিনি পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বাংলার মানুষ যখন সশস্ত্র বাহিনীর সামনে অসহায় হয়ে পড়ে তখনই তিনি আসেন তার অগ্নিঝরা স্বাধীনতার ডাক নিয়ে। যে অগ্নিঝরা কণ্ঠে নিরস্ত্র বাঙালিরা সশস্ত্র বাহিনীতে রূপ নেয়। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চ ঐ ভাষণের ফলে উত্তাল জনসমুদ্রের মাঝে এক চেতনার ধ্বনি গর্জে উঠে। বঙ্গবন্ধু সবসময় বাংলার মানুষের কথা ভাবতেন। তাদের জন্য কথা বলতেন। নিজের জীবনের কথা চিন্তা করতেন না। তার দেওয়া ৭ মার্চের ভাষণ বিশ্ব ঐতিহ্যের প্রামাণ্যদলিল হিসেবে বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে আসীন। আলজেরিয়া জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বিশ্ব দু'ভাগে বিভক্ত। একদিকে শোষক, আরেকদিকে শোষিত। আমি শোষিত মানুষের পক্ষে। তিনি নিজেকে কোনদিন জনগণের থেকে আলাদা করেন নি। জনগণ ও বাংলার মাটিকে তিনি আপন করে নিয়েছিলেন। ইতিহাসও বার বার প্রমাণ করেছে, মুজিব বাংলার, বাংলা মুজিবের। তাঁর মুখে সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে কোন কথা ছিলো না। তিনি সবাইকে এক সুতোয় বেঁধে রাখতেন। তাই তো জনগণকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা থেকে আবৃত্তি করে বলতেন - মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক একবার একজন বিদেশী সাংবাদিক তাঁর ৫২তম জন্মদিনে প্রশ্ন করেন, ৫২ তম জন্মদিনে আপনার বড় ও পবিত্র কামনা কী? উত্তরে স্বভাবসুলভ কণ্ঠে বলেছিলেন, জনগণের সার্বক মুক্তি। বঙ্গবন্ধু কোনদিন তাঁর জন্মদিন পালন করতেন না। তিনি জনগণের সার্বিক কল্যাণ নিয়ে কাজে ব্যস্ত থাকতেন। একবার সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপনকালে বেদনার্ত সুরে বলেছিলেন, আমি জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমের

বাতি জ্বলে না, কেকও কাটি না। এদেশে মানুষের নিরাপত্তা নাই। আপনারা আমাদের জনগণের অবস্থা জানেন। অন্যের খেয়ালে যে কোন মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি জনগণেরই একজন। আমার জন্মদিনই বা কি, আর মৃত্যুদিনই কি? আমার জনগণের জন্য আমার জীবন ও মৃত্যু। আমি তো আমার জীবন জনগণের জন্য উৎসর্গ করেছি। বিশ্বের অনেক বড় নেতাদের সাথে বঙ্গবন্ধুকে তুলনা করা যায়। যারা কখনও নিজেদের পদ মর্যাদা বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ক্ষমতা দখল করেন নি। তারা হলেন- ভারতের মহাত্মা গান্ধী, আফ্রিকার নেলসন ম্যান্ডেলা, ভিয়েতনামের হো চি মিন, তুরস্কের আতাতুর্ক এবং যুগোস্লাভিয়ার টিটো প্রমুখ। এই নেতারা রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বাধীন হয়েছে আলোচনার টেবিলে বসে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু দেশ স্বাধীন করেন দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ত্রিশ লক্ষ মানুষের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা। বাংলার দামাল সন্তানেরা ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর পাক হানাদারদের থেকে ছিনিয়ে আনে বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব। বাংলার আকাশে ওঠে বিজয় সূর্য আর ওড়ানো হয় বিজয় নিশান লাল সবুজের পতাকা। সেই স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি। এ সময় রেসকোর্স ময়দানে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক গুণ মহা সমুদ্রের হৃদয়ের সবটুকু অর্ঘ্য ঢেলে আবেগমথিত ভাষায় বলেন, ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলবো, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। স্থির প্রতিজ্ঞ থেকে বলেন, ভাইয়েরা, তোমাদেরকে একদিন বলেছিলাম, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল। আজকে আমি বলি, আজকে আমাদের উন্নয়নের জন্য আমাদের ঘরে ঘরে কাজ করে যেতে হবে। তিনি দেশে ফিরে যুদ্ধবিধ্বস্ত অবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করেছেন। শূন্য হাতে যাত্রা শুরু করে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশকে গড়ে তুলেছেন। তিন বছর সাত মাস নিরলস পরিশ্রম করে তিনি সেসবের ভিত্তি স্থাপন করেন। স্বাধীনতার পর তিনি যখন বিদেশ সফরে যান তখন তিনি পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রনায়কদের কাছ থেকে তার ত্যাগের জন্য স্বীকৃতি পান। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিভিগিরি, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রপ্রধান নিকোলাই পোদগর্ণি, প্রধানমন্ত্রী আলেক্সেই কোসিগিন, কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লিওনিদ ইলিচ ব্রেজনেভ, যুগোস্লাভিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মার্শল জোসেফ ব্রোজ টিটোসহ বিশ্বের বরেন্দ্র নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন সম্মেলনে বঙ্গবন্ধুকে অপরিসীম শ্রদ্ধা এবং ভক্তি প্রকাশ করেন। কেননা, বঙ্গবন্ধুর অপরিসীম যত্ন ও ভালো উদ্যোগ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাকে সাজিয়েছিলেন নিজের মনের মতো। যেখানে গড়ে ওঠেছিলো একটি স্বাধীন সার্বভৌম ও অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র॥

চিরঞ্জীব শেখ মুজিব

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

বঙ্গবন্ধুর যাদুকরী নেতৃত্বে এই ভূখণ্ডের মানুষ হাজার বছরের পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিঁড়ে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাংলাদেশী আমরা পেয়েছি নিজস্ব জাতি রাষ্ট্র, গর্বিত আত্মপরিচয়। তাঁর উদাত্ত আহ্বানেই বাঙালির যা আছে তা নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল যুদ্ধে। মুক্তি সংগ্রামে একটি কণ্ঠস্বরের উদাত্ত ধ্বনিতেই কম্পিত হয়েছিল শত্রুর পিঞ্জর আর সাহসের জোয়ার বয়ে আসে মুক্তিপাগল বাঙালীর মনে। 'জয় বাংলা' সুখকর ধ্বনির স্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমানকে শোষক পাকিস্তানী শাসকেরাও ভয় পেত। তাইতো মুক্তিযুদ্ধকালীন ৯ মাস কারাগারে বন্দী রেখেও পকিস্তানী পিশাচেরা বঙ্গবন্ধুর লোমমাত্র স্পর্শ করার সাহস দেখাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন স্বাধীন দেশে কেউ তাঁর নিরাপত্তা বিঘ্নিত করবে না বা করতে পারবে না। এই প্রত্যয় থেকেই তিনি বঙ্গভবনের পরিবর্তে থাকতেন তাঁর প্রিয় বাসভবন ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরে। অপরিসর এই বাসভবন থেকেই বঙ্গবন্ধু সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার কাজে ব্রতী হন। বিভিন্নমুখী কর্মসূচী ও কর্মপরিকল্পনার মধ্যদিয়ে তিনি দেশকে ঘুরে দাঁড় করাতে শুরু করছিলেন। কিন্তু একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। বাঙালীর প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর ভালোবাসা ও বিশ্বাসের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলার ইতিহাসের বর্বরোচিত হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করে হত্যা করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যদের। রেহাই পায়নি নারী ও শিশুরাও। তারিখটি ছিল ৩১ শ্রাবণ বা ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ। বাংলার আকাশে ঐদিন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা ঝরেনি; ঝরেছে রক্তধারা। জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তাজারক্তে সিক্ত হয়েছে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বরসহ সকল বাঙালির হৃদয়।

তাই ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট, বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে এক কালো অধ্যায়। কেননা এই দিনেই জাতি হারিয়েছে তার গর্ব, আবহমান বাংলা ও বাঙালির আরাধ্য পুরুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি, ইতিহাসের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। পিতা হারিয়ে জাতি হয়েছে শোকে স্তব্ধ ও বেদনায় নীল। সবচেয়ে বেশি কষ্টদায়ক যে, জাতির পিতৃহত্যায় নেতৃত্ব দেয় এদেশেরই কিছু মানুষ। কিছু অকৃতজ্ঞ ও বিপদগামী দেশি-বিদেশী মানুষ মুজিবের চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলার বুকে কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করে। পরবর্তী সময়ে অনেকে চেষ্টা করেছে ইতিহাসকে বিকৃত করে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে। কিন্তু সত্য আপন আলোয় উদ্ভাসিত হতে থাকে। জাতির জনকের হত্যাকারীরাও শাস্তির সম্মুখীন হতে থাকে। বিশ্বাস করি দেশ-বিদেশের সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতায় ও কূটনৈতিক তৎপরতায় বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী সকলেই অচিরেই যথোপযুক্ত শাস্তির আওতায় আসবে। যখন তা সম্পন্ন হবে তখন জাতি অভিশাপ মুক্ত হবে।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল একটি নাম শেখ মুজিবুর রহমান। বাংলার মানুষকে তিনি যেমন অকৃত্রিমভাবে ভালবেসেছেন, বাংলার মানুষও তাঁকে পিতা ও বন্ধু বলে যোগ্য প্রতিদান দিচ্ছেন। আসলে ঈশ্বর-ই বাঙালি জাতিকে ভালবেসে এ মহান নেতাকে উপযুক্ত সময়ে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। যিনি নিজ জীবনের বিনিময়ে বাঙালির স্বাধীনতা, উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন। জনসাধারণের কল্যাণ ছিল তাঁর নীতি ও প্রশাসনের ভিত্তি। বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্প্রীতি ও শান্তির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। আর তাই তো প্রকৃত মুসলমান হয়েও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে জাতীয় মূলনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন। পারম্পরিক শ্রদ্ধাবোধে প্রোথিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দর্শন ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। যে বাংলাদেশে গরীব-দুঃখী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী-পুরুষ তথা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই যার যার অধিকার নিয়ে ও দায়িত্ব পালন করে সুখে শান্তিতে বসবাস করবে। ধর্মীয় গোঁড়ামী, অন্যায়ের কাছে নতি, দল-গোষ্ঠী-স্বজনপ্রীতি ছিল তাঁর নীতি বিরোধী। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে তিনি কৃষির উপর বিশেষ জোর দেওয়ার সাথে-সাথে বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও কূটনীতিতে দেখান মুন্সিয়ানা। দেশের মানুষ ও জাতির উন্নয়নের জন্য সম্ভবপর সকল কর্মসূচীই বঙ্গবন্ধু গ্রহণ করেন। দরিদ্র বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করতে তিনি আমরণ চেষ্টা করেন। বিশেষভাবে দরিদ্র, পিছিয়ে পড়া মানুষে ও আদিবাসীদের প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল বিশেষ দরদ ও ভালবাসা। ফরাসী দার্শনিক বার্ণার্ড লেভি বলেছেন, বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের দুঃখী মানুষের নেতা। তার মতে, এই ধরণী যুগে যুগে যত মহা মানবের জন্ম দিয়েছে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাদের মধ্যে অন্যতম এবং অনন্য। শেখ মুজিবের কারণেই বাংলাদেশের সৃষ্টি। তাই দেশ ও জাতির প্রতিটি মানুষের অন্তরে শেখ মুজিব চিরঞ্জীব।

অনেকে মনে করেন, মানবতা, সত্য-ন্যায়ের জন্য বলিষ্ঠতা এবং মানুষের কল্যাণ করার দৃঢ়চেতনা শেখ মুজিব পেয়েছিলেন নিজ পরিবার ও মিশনারী স্কুলে পড়াশোনার করার কারণে। যিশু খ্রিস্টের শিক্ষা 'তারা সকলে যেন এক হয়' এবং সবকিছুতে মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণ করা দেখতে পাই বঙ্গবন্ধুর জীবন দর্শনে। কিশোর মানসে যা প্রোথিত হয়েছিল তা-ই তো প্রকাশিত হয়েছে পরবর্তীতে এই মহান নেতার জীবনে। তাঁর জীবন দর্শনের একটা নমুনা তাঁর উক্তি থেকেই পেতে পারি;

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি। একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায়। এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা, যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে।" *(শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)*

এই নিস্বার্থ ভালোবাসাই ছিল তাঁর শক্তি ও সাহসের উৎস। সর্বাবস্থায় চেয়েছেন মানুষের মঙ্গল। আসলে জনসাধারণের কল্যাণ ছিল তাঁর নীতি ও প্রশাসনের ভিত্তি। সমাজে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের সম্মান দেখাতে তিনি কার্পণ্য করতেন না। বাংলার সমৃদ্ধ ঐতিহ্য সম্প্রীতি ও শান্তির প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। আর তাই তো প্রকৃত মুসলমান হয়েও ধর্ম নিরপেক্ষতাকে জাতীয় মূলনীতিতে নিয়ে এসেছিলেন। পারম্পরিক শ্রদ্ধাবোধে প্রোথিত অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার দর্শন ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের। কিছু অকৃতজ্ঞ ও বিপদগামী দেশি-বিদেশী মানুষ মুজিবের চেতনাকে ধ্বংস করার লক্ষ্যে তাঁকে সপরিবারে হত্যা করে বাংলার বুকে কলঙ্কের ইতিহাস রচনা করে। চেষ্টা করেছে ইতিহাসকে বিকৃত করে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করতে। কিন্তু তাদের চক্রান্ত পরাভূত হয়েছে। জাতির জনকের কণ্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক পরিচিতি আন্তর্জাতিক মহলে আরো সুদৃঢ় হয়েছে। পিতার সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে চলা অকুতোভয় জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধুর চেতনাকে আরো উজ্জীবিত করে চলেছেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি সোনার বাংলা চেয়েছিলেন। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে আপামর জনগণ যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করে। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী মাত্র ৪ বছর সময়ের মধ্যেই স্বাধীনতার স্থপতি ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করে সোনার বাংলা থেকে তাঁর নাম চিরতরে মুছে ফেলতে চায় কুচক্রীমহল। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে বাংলার মাটি থেকে, বাঙালির মনন থেকে মুছে ফেলা কখনোই সম্ভব নয়। দেশের কোনো না কোনো প্রান্তে প্রতি মুহূর্তেই ধ্বনিত হচ্ছে ও হবে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। কবিতার ছন্দে ভারতের বিখ্যাত সাহিত্যিক অন্নদাশংকর রায় বলেন :

যতদিন রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান;
ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান।
দিকে দিকে আজ অশ্রুগঙ্গা রক্তগঙ্গ বহমান;
তবু নাই ভয় হবে হবে জয়; জয় মুজিবুর রহমান ॥

বাঙালীর মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজবুর রহমান চিরঞ্জীব-তাঁর চেতনা অবিনশ্বর। বাঙালী জাতির চিন্তা-চেতনায়, অস্থিমজ্জায় মিলে আছেন তিনি। তাই প্রতিকূলতার মধ্যেও প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের কাছে শেখ মুজিবের চেতনা চির বহমান॥

কাথলিক মণ্ডলীতে কেন থাকব?

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

ভূমিকা: বর্তমানে অনেক দেশের কাথলিক মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে অনেকের কাথলিক মণ্ডলী থেকে বেড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার অনেক মানুষই এখন নিজেদেরকে কাথলিক মণ্ডলী ত্যাগ করা "প্রাক্তন সদস্য" বলে দাবী করেন। তাদের যুক্তি হল কাথলিক চার্চ বা মণ্ডলী অতীতে অনেক সামাজিক অন্যায্যতা ও মানবতা-বিরোধী পাপের সঙ্গে জড়িত ছিল; বা কোন কোন ক্ষেত্রে এখনও জড়িত আছে। মানব সভ্যতা উন্নয়নে, শিক্ষা-দীক্ষায়, বর্তমান জগতে ন্যায্যতা ও শান্তি স্থাপনে ও পৃথিবীতে ভালবাসার সংস্কৃতি স্থাপনে এককভাবে সব চাইতে বেশী কার্যকর অবদান রেখেছে ও এখনও রেখে যাচ্ছে। পৃথিবীর আর কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কাথলিক চার্চের মত এত অবদান রেখেছে বলে দাবী করতে পারবে না। এই নিয়ে কাথলিক মণ্ডলীর সর্বস্তরের খ্রিস্টভক্তরাই গর্বিত। তবে কাথলিক মণ্ডলীর নিকট অতীতে যেসকল কলঙ্কজনক বিষয় সংঘটিত হয়েছে বা এখনও যে কিছু কিছু অন্যায়তা ও পাপের ঘটনা বেড়িয়ে আসছে, তার জন্য কাথলিক মণ্ডলীর অতীত গৌরব অনেকটাই ম্লান হতে চলেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মত আমাদের দেশের অনেক খ্রিস্টভক্ত এখন আর গির্জা প্রার্থনা করে না বা নামে মাত্র ধর্মকর্ম করে। এখন অনেকেই প্রশ্ন করেন, এত পাপ ও কলঙ্কজনক ঘটনা জানার পরে কিভাবে কাথলিক মণ্ডলীর সদস্য থাকা যায়?

কাথলিক মণ্ডলীর পাপ ও কলঙ্ক: এই প্রশ্ন অবশ্যই যৌক্তিক ও গুরুত্বপূর্ণ। অতীতের ইতিহাসে বা বর্তমানেও কাথলিক মণ্ডলীর অনেক পাপ আছে যার কারণে এই প্রশ্ন করা যেতেই পারে। কাথলিক চার্চের এই পাপের তালিকায় আছে: অন্যায্যতার কারণে বিভিন্ন স্থানে তদন্ত ও বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়া, দাস প্রথার প্রতি সমর্থন দেওয়া, ঔপনিবেশিক শাসনের সময় মণ্ডলীর ভূমিকা, বর্ণপ্রথার সঙ্গে এর সম্পর্ক, নারী অধিকার দমনে মণ্ডলীর ভূমিকা, অতীতে ও বর্তমানে অব্যহত অন্যায্যতা দেখেও কিছু না বলা বা না করা, সাদা চামড়ার প্রাধান্য (White Supremacy), পূজিবাদী নীতিকে (Capitalism) সমর্থন করা, সৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীকে সমর্থন করা, ইত্যাদি। তাছাড়া নিকট অতীতে যাজকদের যৌন কেলেঙ্কারী (Clergy Sex Scandal) ও বিশেষভাবে শিশুদের যৌন নির্যাতন (Pedophilia) কাথলিক মণ্ডলীর ভাবমূর্তি কলঙ্কিত করেছে। অতি সম্প্রতি কানাডায় কয়েকটি বন্ধ হয়ে যাওয়া কাথলিক স্কুলে আদিবাসী শিশুদের গণকবর আবিষ্কার কাথলিক মণ্ডলীকে জবাবদিহীতার মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছে। কাথলিক মণ্ডলীকে এইসব কারণে সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকে তার দোষগুলিকে অতিরঞ্জিত করে এবং কঠোর ও ভারসাম্যহীন ভাষা প্রয়োগ করে সত্য; কিন্তু তা হলেও কাথলিক মণ্ডলী উপরোক্ত অভিযোগগুলি অস্বীকার করতে পারবে না বা এগুলির দায় এড়াতে পারবে না।

মণ্ডলী একাই শুধু পাপী ও দোষী নয়: তবে এমন সব দোষের জন্য মণ্ডলী একাই যে দায়ী, তা কিন্তু নয়। এমন অভিযোগ পৃথিবীর অনেক দেশের বিরুদ্ধেই আনা যাবে। আমাদের দেশও তার ব্যতিক্রম নয়। ইউরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মানুষ কিভাবে এমনসব দেশে বসবাস করতে পারে, যেগুলির ইতিহাস বর্ণ বৈষম্য (Racism), দাসপ্রথা (Slavery), ঔপনিবেশিকতা (Colonialism), আদিবাসীদের গণহত্যা (Genocide), ধনী-দরিদ্রদের মধ্যে অসাম্য (Inequality), অভিবাসন প্রত্যাশীদের (Immigrants) প্রতি দেশের সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়া, বৈষম্য ও ঘৃণার সংস্কৃতি, ইত্যাদির দোষে দুষ্ট? এশিয়া আফ্রিকার দেশগুলি কি এইসব দোষ থেকে মুক্ত? তা বলা যাবে না। আমাদের দেশসহ এশিয়ার দেশগুলিতেও বর্ণপ্রথা বা জাতিভেদ, নব্য দাসপ্রথা, গণহত্যা, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য রক্তপাত, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে প্রকট বৈষম্য, ইত্যাদির মত ইতিহাস রয়েছে। তাহলে শুধু কাথলিক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অভিযোগের তর্জনী তোলা কতটা যুক্তি-যুক্ত? কারণ আমরা যে সকল দেশে বসবাস করছি, সে সকল দেশ আর সকল জাতিই নির্বিশেষে এইসব বা সমরূপ পাপের দ্বারা দুষ্ট। কাথলিক মণ্ডলী নিজের অপরাধ স্বীকার করলেও, সেইসব অপরাধ মণ্ডলীর মাত্র অল্প কিছু সদস্যই করেছে, সকলে নয়। অপর দিকে মণ্ডলীর আরও অনেক বেশি সদস্য মানবতার সেবায় জীবনপাত করেছে; তাঁদের আধ্যাত্মিক জীবন, তাঁদের ত্যাগস্বীকার, মানবসেবায় তাঁদের অবদান, পৃথিবীকে আরও বেশি বাসযোগ্য ও সুন্দর করার তাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা, ইত্যাদি কাথলিক মণ্ডলীর ভাবমূর্তি জাজ্বল্যমান করে তুলেছে। মণ্ডলীর মধ্যেই অনেক মানুষ সাধু ও সাধ্বী হয়েছে। তাই মণ্ডলীর যে সকল সদস্য তাদের পাপের দ্বারা কাথলিক মণ্ডলীকে কলুষিত করেছে, তাদের দায় কাথলিক মণ্ডলী নিবে কেন? তাদের ব্যক্তিগত পাপের দায় তাদেরই, কাথলিক মণ্ডলীর নয়। তাহলে আমি যে কাথলিক মণ্ডলীতে থেকে যাব তার কারণ ও যুক্তি আছে।

আমি কেন কাথলিক?: প্রথমত: কাথলিক মণ্ডলী হচ্ছে আমার মা, যে আমাকে নতুন জীবন ও ভালবাসার ভাষা শিক্ষা দিয়েছে। সে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে বিশ্বাস, ঈশ্বর সম্পর্কে আমাকে জ্ঞান দিয়েছে, ঈশ্বরের বাণী শুনিয়েছে, প্রার্থনা করতে শিখিয়েছে, আমাকে সাক্রামেন্ত বা পুণ্য সংস্কারসমূহ দান করেছে, সদ্গুণ অর্জনের পথ দেখিয়েছে এবং আমাকে কিছু জীবন্ত সাধু ও সাধ্বীর সংস্পর্শে জীবন কাটাতে আমাকে সাহায্য করেছে। তার মাধ্যমেই আমি জানতে পেরেছি যে মণ্ডলীতে পাপী থাকলেও সাধুদের সংখ্যাই বেশি। এর অসংখ্য দুর্বল দিক থাকা সত্ত্বেও এখানে থাকার জন্য আমার যথেষ্ঠ ও উপযুক্ত কারণ আছে, যা যথেষ্ঠ কল্যানকর ও পবিত্র। তাই তো নৈতিকভাবে আমি কাথলিক মণ্ডলীরই উপর আস্থা রাখি, যে-আস্থা আমি অন্য কোন ধর্মে বা সমাজে রাখতে পারি না - আমার আত্মা এখানকারই বাসিন্দা। অন্য ধর্মের বা সংস্কৃতির মানুষদের সঙ্গে উপাসনা করতে, সংলাপ করতে ও সহাবস্থান করতে আমার কোন কোন সমস্যা নেই। তা সাচ্ছন্দেই করতে পারি, যে কাথলিক মণ্ডলীতে আমি বেড়ে উঠেছি সেখানেই আমি বাড়ীতে থাকার বা মাতৃভাষায় কথা বলার মত তৃপ্তি ও আনন্দ পাই।

দ্বিতীয়ত: কাথলিক মণ্ডলীতে অনেক পাপী

আছে,তা অস্বীকার করার উপায় নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এই মণ্ডলীর নির্ভীক ধর্মশহীদ, পবিত্র সাধু-সাধ্বী, অসংখ্য উদারপ্রাণ ও মহান ব্যক্তি রয়েছেন যারা আমার জন্য আদর্শ। আমি এইসব মহাপ্রাণ, উদার, পবিত্র আদর্শবান ব্যক্তিদের অনুকরণ ও অনুসরণ করব, পাপীদের নয়। যারা পাপ করে মণ্ডলীর সর্বাঙ্গে কলঙ্ক লেপন করেছে, তারা ঈশ্বর ও মণ্ডলীর আইন অমান্য করেছে - তাদের আহ্বানের জীবনে উপযুক্তভাবে সাড়া দিতে ব্যর্থ হয়েছে। নৈতিকভাবে আমি তো ব্যর্থদের অনুসরণ করতে পারি না। আমারও অনেক ব্যর্থতা রয়েছে; কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি যারা তাদের জীবনে সফল হয়েছে, আমি তাদেরই অনুসরণ করব।

সবশেষে একটি অতিগুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করতে চাই। আমি মণ্ডলীতে থাকব, কারণ মণ্ডলীই আমার জীবনে সবকিছু। মণ্ডলী ত্যাগ করে আমি কোথায় যাব? এর চেয়ে ভাল স্থান কোথায় পাব? সত্য বলতে কি আমার মনে হয়, মণ্ডলীর চেয়ে ভাল স্থান আমার জন্য আর নেই। মণ্ডলীর পাপ ও কলঙ্কের কথা মনে হলে মণ্ডলী ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা আর ধর্মশহীদ ও সাধুসাধ্বীদের সংসর্গে থাকার বাসনা - এই দুইয়ের পরস্পর-বিরোধী অবস্থায় আমরা বিচক্ষণ সিদ্ধান্ত নিব, এটাই স্বাভাবিক। যিশুর চ্যালেঞ্জপূর্ণ মনপরিবর্তনের উপদেশ শুনে সকলেই যখন চলে যাচ্ছিল, তখন যিশু তাঁর শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন, "... কি তোমরাও কি চলে যেতে চাও?" পিতর সব শিষ্যদের হয়ে উত্তর দিলেন, "... আমরা যেতাম, কিন্তু আমরা কোথায় কার কাছে যাব, প্রভু! আমাদের তো এর চেয়ে ভাল জায়গা আর নেই! আপনি যা-ই বলুন, অনন্ত জীবনের বাণী - সে তো আপনার কাছেই আছে" *(যোহন ৬:৬০-৭১)*।

সাধু পিতর আসলে কি বলতে চেয়েছেন তা হলো, "প্রভু যিশু, আমরা তোমাকে বুঝতে পারি না, আর যা বুঝতে পারি তা আমাদের ভাল লাগে না। তা সত্ত্বেও অন্য কোথাও চলে যাওয়ার চেয়ে, আপনার সঙ্গেই আমরা ভাল আছি; আপনিই আমাদের সব"। একইভাবে কাথলিক মণ্ডলীই আমাদের সব। আমরা আর কোথায় যাব, কোথায় পাব এর চেয়েও ভাল একটি আশ্রয়? মানুষ হিসাবে আমরা 'আধ্যাত্মিক' কিন্তু তাই বলে আমরা সকলেই তো আর সন্ন্যাসী নই। তবে যদি কেউ বলে, 'এমন এক অপবিত্র ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি থাকব না', তা হবে স্বার্থপরের মত পালিয়ে যাওয়ার শামিল। এমন লোকের জন্য তা কোন ক্রমেই ভাল হবে না। একা আমরা কিছুই করতে পারি না; কিন্তু যদি আমরা সমষ্টিগতভাবে সত্যের অনুসন্ধান করি ও সেবা করি তাহলে আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারে কাথলিক মণ্ডলীকে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। মণ্ডলীকে নিয়ে আমরা একা কোন স্বপ্ন দেখে তা পূরণ করতে পারব না; আমরা সকলে মিলে যদি মণ্ডলীর জন্য একটি স্বপ্ন দেখি তা পূরণের দায়িত্বও আমাদের সকলের। আমরা সকলে মিলে সেই আদর্শ ও পবিত্র মণ্ডলী, যা আমরা চাই, গড়ে তোলার স্বপ্ন পূরণ করতে পারব। আমি এর বাইরে মণ্ডলীকে দেখতে পারি না।

অন্য কোন নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র মণ্ডলী নেই:

কাথলিক মণ্ডলী ত্যাগ করে আমরা কোন মণ্ডলীতে যাব? কোথায় পাব সেই পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও আদর্শ মণ্ডলী যেখানে আমরা যেতে পারি? এমন মণ্ডলী তো কোথাও পাব না; কারণ এমন কোন দেশ, ধর্ম ও মণ্ডলী নেই যার অতীত বা বর্তমান কোন না কোন পাপের দ্বারা বিদ্ধ নয় বা কলঙ্কিত নয়! আমরা সকলেই যেহেতু এই মণ্ডলীর সদস্য, কাথলিক মণ্ডলীর সকল দোষ ও কলঙ্কের দায়ও আমাদের নিতে হবে, এটাই আসল ও ন্যায্য পথ। কাথলিক মণ্ডলীর ইতিহাস, আমাদেরই ইতিহাস; মণ্ডলীর পাপ আমাদেরই পাপ; মণ্ডলীর পরিবার আমাদেরই পরিবার। এটাই আমাদের স্থায়ী পরিবার। অনেকেই বর্তমানে বলে, 'আমি পূর্বে কাথলিক ছিলাম'; এমন লোকের সংখ্যা পশ্চিমের দেশগুলিতে বেড়েই চলেছে। কাথলিক মণ্ডলী ত্যাগ করার তাদের অনেক কারণ আছে; তবে তা ঈশ্বরের উপর বিশ্বাসের সংকট থেকে নয়, বরং মণ্ডলী-কেন্দ্রিক। পরবর্তীতে তা ঈশ্বরের উপর তাদের বিশ্বাসের সংকট হয়ে দাড়ায়।

উপসংহার:

সম্প্রতি বিভিন্ন দেশে কাথলিক যাজকদের দ্বারা শিশুদের যৌন নির্যাতন, কাথলিক মণ্ডলীর উচ্চ পর্যায়ের কার্ডিনাল, বিশপ ও যাজকগণের মণ্ডলীর অর্থ তসরুফ এবং কানাডায় প্রাক্তন কাথলিক স্কুলে গণকবরের সন্ধান লাভের মত কেলেঙ্কারীগুলি প্রকাশ হওয়ার ফলে কাথলিক মণ্ডলীর বিশ্বাস যোগ্যতা (Credibility) ও ভাবমূর্তি (Image) প্রশ্নের মধ্যে পড়ে। এইসব কেলেঙ্কারী ও পাপের জন্য অভিযুক্তদের বিচারের আওতায় আনা হয়েছে ও হচ্ছে; তাদের শাস্তিও হচ্ছে। কাথলিক মণ্ডলীর এতসব পাপ ও কেলেঙ্কারী দেখেও বিশ্বাসী ভক্ত হিসাবে আমাদের মন খারাপ হওয়াই স্বাভাবিক। তবে এইসব পাপ ও কেলেঙ্কারী ধর্মে বা কোন দেশে নেই? মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের আহ্বান হলো পবিত্রতার পথে চলা; কিন্তু মণ্ডলীর কোন ভক্তসদস্য যদি তা পালন করতে ব্যর্থ হয় বা তা পালন না করে, কাথলিক মণ্ডলীতো তার জন্য দায়ী নয়!

তবে যা-ই হোক, আমরা ঐশবাণীর সুশৃঙ্খল ব্যাখ্যা (Exegesis), প্রেরিতশিষ্যদের আমল থেকে আজ পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ঐতিহ্য (Tradition) এবং মণ্ডলীর কর্তৃপক্ষের ধারাবাহিক শিক্ষা মালা (Magisterium), কাথলিক পোপগণের নৈতিক কর্তৃত্ব (Moral Authority), ইত্যাদি কাথলিক মণ্ডলীর বাইরে আর কোথায় পাব? পৃথিবীতে অনেক দেশ আছে, ধর্ম আছে, সংস্কৃতি আছে এবং সংস্থা আছে কিন্তু কাথলিক মণ্ডলীর মত জগতের অগ্রগতিতে, মানব সভ্যতা উন্নয়নে, ভালবাসার সংস্কৃতি ও শান্তি আনয়নে, আর এমনকি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে কাথলিক মণ্ডলীর মত এত বিশাল অবদান আর কার আছে? পৃথিবীকে মানব জাতির আরও অধিক বাসযোগ্য করার জন্য কাথলিক মণ্ডলীর নিরন্তর প্রচেষ্টা কারও অবিদিত নয়। ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভেদ ও রাজনৈতিক কুটকৌশলের বেড়ি ডিঙ্গিয়ে মানব জীবনের মর্যাদা রক্ষার জন্য, বিপন্ন মানবতাকে পথের দিশা দিতে, ধনী গরীবের বৈষম্য দূর করে ন্যায্যতা স্থাপনে, দরিদ্রদের ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠির পক্ষ সর্মথন করে, শিক্ষা বিস্তার করে জগতের বিবেককে জাগ্রত করতে, স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আর্তমানবতার সেবা দিয়ে, ইত্যাদি আরও অনেকভাবে কাথলিক মণ্ডলী যে ভালবাসা, ন্যায্যতা ও শান্তির এক পৃথিবী গড়তে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আমরা তার জন্য গর্বিত হব না কেন? তাই কাথলিক মণ্ডলীর কিছু বিভ্রান্ত সদস্যের পাপ ও কেলেঙ্কারী থাকা সত্ত্বেও আমি কাথলিক মণ্ডলীতেই থাকব। কারণ আমি কাথলিক মণ্ডলীর অগণিত সাধু সাধ্বীগণ, ধর্মশহীদগণ, মহামানবগণ এবং সৎ ও সরলপ্রাণ অসংখ্য খ্রিস্টভক্তগণের সঙ্গেই থাকতে চাই॥

প্রবীণ দিবস : একটি অনুচিন্তন

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)

নতুনের জন্ম দিবেন আপনারাই: এই পর্যায়ে অনেকেই হয়তো বলবেন: আপনার অনেক বয়স হয়েছে; শক্তি কমে যাচ্ছে। আবার নিঃসঙ্গতাই আপনার এক বড় বোঝা! এমন অবস্থায় কি আপনি পারবেন এই আহ্বান অনুসারে কজগুলো করতে? বাইবেলে দেখি যে, নিকোদেমও যিশুকে প্রশ্ন করে বলেছিল: "একজন বয়স্ক মানুষ কী করেই আবার নতুন করে জন্ম নিতে পারে ? " *(যোহন ৩:৪)*। ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দাদু-দিদিমা, প্রবীণগণ, আপনারা পারবেন ! শ্রদ্ধা নিয়েই বলছি; আপনারা পবিত্র আত্মার ক্রিয়া তথা প্রেরণার উপর বিশ্বাস রাখেন, তিনিই আপনাদের মধ্যদিয়ে এই কাজ করবেন। পবিত্র আত্মার প্রতি উন্মুক্ত থাকুন! আপনারা জীবনে সুখ-দুঃখ, আনন্দ- বেদনা, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা; ন্যায়-অন্যায়; শান্তি-অশান্তি; সাম্য-বৈষম্য অনেক কিছু অভিজ্ঞতা করেছেন এবং মূল্যবোধ অভিজ্ঞতা করেছেন। অতএব আপনাদের এই মহামূল্য স্মৃতিগুলো তরুণদের কাছে তুলে ধরুন। দেখবেন, তরুনরা নতুন-নতুন দিকদর্শন দেখতে পাবে, নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন সমাজ গড়ার জন্য কাজে নামবে; এই নতুন সমাজে বাস তো করবেন আপনারাই আপনাদের এই তরুন নাতী-নাতনীদের নিয়েই। অতএব বলা যায় এই নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী গড়ার জন্য আপনাদের ও তরুণদের সবারই প্রয়োজন।

আপনাদের তিনটি স্তম্ভ: পোপ মহোদয়ের বাণীর আলোকে উপরোক্ত নতুন সমাজ, নতুন পৃথিবী গড়ার জন্য আপনাদের রয়েছে তিনটি স্তম্ভ: স্বপ্ন (dreams), স্মৃতি (memory) ও প্রার্থনা (prayer) এই তিনটি স্তম্ভেও কাজে প্রভুই আপনাদের নিত্য সহায়।

স্বপ্ন (dreams): আপনারা স্বপ্ন দেখবেন শান্তির সমাজ, ন্যায্যতার সমাজ, মিলনের সমাজ। এই প্রসঙ্গে প্রবক্তা যোয়েলের প্রতিশ্রুতি, "তোমাদের বৃদ্ধারা নানা দিব্য স্বপ্ন দেখবে সেদিন, তোমাদের তরুণেরা নানা দিব্য দর্শন দেখবে" *(যোয়েল ৩:১)*। প্রবীণ ও তরুণদের এই ভূমিকা বা সন্ধির (covenant between young and old) উপর নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ পৃথিবী। মাত্র তরুণরাই পারে প্রবীনদের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করতে। "Only the young can take the dreams of the elderly and make them come true."

স্মৃতি (memory): এই স্বপ্নগুলোর আলোকে আপনাদের অভিজ্ঞতালব্ধ স্মৃতিগুলো তথা আপনাদের সময়কার সুন্দর ও মূল্যবোধগুলো ওদের সামনে তুলে ধরবেন। ধরি আপনারা বলবেন যে, আপনাদের যুবাকালে আপনারা দরজা-জানালা খোলা রেখেই রাতে ঘুমাতেন! কেউ কারো জিনিস চুরি করতো না; আপনারা প্রবীনদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং আরো। জীবনে অনেক দুঃখ-কষ্ট ব্যথা-বেদনা পেরিয়ে এসেছেন; বর্তমানেও পার করছেন এই করোনা সংকটকালে। সাবাস! বর্তমানেও আপনাদের এই অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগান। আপনাদের এমন স্বপ্ন ও স্মৃতির সহভাগিতা sharing/pass on বা "গল্প-বলাই" তরুণদের নতুন-নতুন দিকদর্শন (vision) বা পথ দেখাবে স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য। তাই আপনাদের কাজ হবে স্মৃতিগুলোকে জীবন্ত রাখা হস্তান্তর করার মধ্যদিয়ে। এটাই হবে আপনাদের প্রেরণকাজ (mission work)। এইভাবেই দেখি যে স্বপ্ন স্মৃতির সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত (intertwind) এক কথায় স্মৃতিই জীবন !

প্রার্থনা (prayer): পোপ ফ্রান্সিসের পূর্বসূরী অবসরপ্রাপ্ত পোপ বেনেডিক্ট বলেন: প্রবীণদের প্রার্থনাই জগতকে রক্ষা করতে পারে। প্রবীণদের প্রার্থনা হল এক মূল্যবান সম্পদ (precious resource) এবং বর্তমান জগত ও মণ্ডলীর জন্য খুবই জরুরী। জগত ও মণ্ডলী বৈশ্বিক এক মহামারীর ঝড়ের মধ্য দিয়ে জীবন-তরী বয়ে যাচ্ছে। এই সময় দাদু-দাদী, নানা-নানী, প্রবীণগণ, ঈশ্বরের কাছে আপনাদের অনুনয়-প্রার্থনা বর্তমান জগত ও মণ্ডলীকে শোনাবে আশার বাণী: তরী একদিন তীরে ভিড়বেই! নতুন পৃথিবী বাস্তবে আসবেই!

উদাহারণ: ধন্য চার্লস দ্যা ফুকো এবারে পোপ মহোদয়ের সাথে আসুন এক ধন্য ব্যক্তির উদাহরণ টানি: ধন্য চার্লস দ্যা ফুকো। তিনিও নির্জনে নিঃসঙ্গতায় পাহাড়ের গুহায় প্রার্থনায় দিনপাত করেছিলেন; প্রার্থনা দীন-দুঃখীদের জন্য, বিপদগ্রস্তদের জন্য। আর এইভাবেই হয়ে উঠেছিলেন তিনি সবার ভাই, সার্বজনীন ভাই। অতএব তার এই জীবন দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দেয় যে, আমরা/আপনারা নিজ মরুপ্রান্তরের নিঃসঙ্গতা দিনপাত করার মধ্যদিয়েও বিশ্বের দীন-দুঃখীদের জন্য প্রার্থনা করে সবার ভাইবোন হয়ে উঠতে পারি/পারেন।

আসুন প্রবীণদের সাথে এক হয়ে বর্তমানের এই করোনা-সংকটকালে আক্রান্ত সকল দুঃখী ভাইবোনদের জন্য প্রার্থনা করি।

আমরা সবাই ভাইবোন: এ পর্যন্ত আলোচনা আমাদের বলে দেয় যে, কেউই একা গড়ে না; কেউই একা পরিত্রাণ পায় না। প্রতি মুহূর্তে, প্রতিটি বাস্তবতায় ও প্রকল্প বাস্তবায়নে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রয়োজন। এইভাবেই আমরা সবাই ভাইবোন (fratelli tutti)। প্রবীণদের প্রয়োজন স্বপ্ন, স্মৃতির সহভাগিতা এবং তাদের প্রার্থনা ; আর তরুণেরা প্রবীণদের করবে শ্রদ্ধা; তাদের স্বপ্ন ও স্মৃতিগুলোর মূল্য দিবে এবং বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করবে উদ্যোগ। অতত্রব ভ্রাতৃত্বে ও সামাজিক সম্পর্কে আগামী বিশ্ব গড়ার জন্য দাদু-দাদী, নানা-নানী ও প্রবীণদের প্রয়োজন।

শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণেরা, আপনাদের ভূমিকা অনেক! দায়িত্ব অনেক! আপনাদের গুরুত্ব অনেক! এবং এই কাজে আপনাদের কাছে প্রভুর বাণী: "আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদাই আছি।" তরুণদেরও মূল্য অনেক! ওদের ভালবাসুন; ওদের প্রতিভার প্রশংসা করুন, স্বীকৃতি দিন; কারণ ওরাই তো স্বপ্ন পূরণের, নতুন পৃথিবী গড়ার হাতিয়ার! তাই ওদেরকেও বারবার বলুন যিশুর এই একই উক্তি: "আমি তোমাদের সঙ্গে সর্বদাই আছি।"

তৃতীয় পর্যায়

একটি রুঢ় বাস্তবতা: বাস্তব যে এই ডিজিটাল যুগে পিতামহ, পিতামহি এবং সব প্রবীণই বেশির ভাগই নিঃসঙ্গতায় ভোগে ; যত্নের অভাবে কষ্ট পায়; অনেক সময় খাদ্যাভাবে কষ্ট পায়। প্রত্যন্ত অঞ্চলে দেখা যায়, বিছানায় পড়েই আছে দাদু বা দাদী ! ঘরে একা একা বসেই আছে ! পাশে অন্যেরা টিভিতে সিরিয়াল দেখছে ! আবার হয়তোবা অনেকেই প্রবীণদেও দাদু-দাদী, নানা-নানীদের 'বুড়া-বুড়ী' 'বুইরা বুরি' আখ্যায়িত করে; তাঁদের অবজ্ঞার চোখে দেখে, শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করে! অনেক সময় দেখা যায় বৃদ্ধ বাবা/দাদু মা/দাদী ছেলেকে বা নানীকে 'ভয়' করে চলে, কারণ পোলার বা নাতীর কামাই খায় ! এবং আরো অনেক ব্যথাময় করুণ বাস্তবতা । মনে রাখি, যারা প্রবীণ, যারা senior/elderly তাদেরও হৃদয় আছে; আছে বোধশক্তি, আছে অনুভূতি বা feelings, আছে আবেগ emotions । কেউ প্রকাশ করে নীরবতায়, আবার কেউ স্বাভাবিক থেকেই হাসি ফুটায় মুখে; কিন্তু অন্তরে যা বাস্তব, তা-তো থেকেই যায়।

একটি উদাত্ত আহ্বান : আসুন, চেতনায়, প্রেরণায় চিত্তকে জাগ্রত করি। বিশ্বাস করি যে, **প্রবীণদের মূল্য রয়েছে অনেক**। উল্লেখিত আচরণ ত্যাগ করি ! অন্তরে শুনি বিবেকের সতর্ক-বাণী: "তুমিও/তোমরাও একদিন

১২ পৃষ্ঠায় দেখুন

করোনা বাস্তবতায় সাধু যোসেফ-বর্ষে “রোগীদের আশা” সাধু যোসেফ

ফাদার সুশীল লুইস

(গত সংখ্যায় প্রকাশের পর)

পুরাতন যুগে দয়াবান ঈশ্বর নানাভাবে মানুষকে নিরাময় করতেন, তাদের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিতেন বিভিন্ন ব্যক্তি ও উপকরণের মাধ্যমে। এভাবে যুগে-যুগে সাধু-সাধ্বীগণের মধ্যস্থতায় ঈশ্বর অনেক নিরাময়ের কাজ করেছেন। আর বর্তমানে সাধু যোসেফের এ বছরে বিশ্বস্ত ঈশ্বর সেবক সাধু যোসেফ সবার আশা হতে পারেন। বিশেষভাবে যারা করোনায় আক্রান্ত বা অন্য কোনভাবে অসুস্থ্য। ঈশ্বর তাঁকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর মধ্যে শক্তি দিয়ে দিয়েছেন। সাধু যোসেফের নামে প্রতিষ্ঠিত অনেক তীর্থমন্দিরে অসংখ্য ধন্যবাদ লিপি, বিভিন্ন পত্রিকায় নানা সত্য ঘটনা তা প্রকাশ ও প্রমাণ করে। কারণ কাথলিক মণ্ডলী ভক্তদের সামনে সুন্দর ধারণা দিয়ে তাঁকে “রোগীদের আশা” বলে উপাধি দিয়েছেন যেভাবে মারীয়াকে ডাকা হয় “রোগীদের সান্ত্বনা” বলে। উপাসনায় আমরা সাধুদের স্মরণ ক’রে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। অনেকবার শুনি করোনা ভাইরাস দূর করতে বর্তমানে প্রার্থনা হল এক বড় অস্ত্র। আমরা নানাভাবে সাধুদের সহায়তা পাই, তার মধ্যে একটি হল তাঁদের অনুনয়ের সহায়তা। আমরা তার মধ্যস্থতার নিশ্চয়তা লাভ করি।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ২৬৮৩ নং অনুচ্ছেদ সাধুসাধ্বীদের বিষয়ে বলে: “বর্তমানে তাদের মিনতি দ্বারা প্রার্থনার প্রাণবন্ত ঐতিহ্যে অংশগ্রহণ করেন। তারা ঈশ্বরের ধ্যানে ও তার প্রশংসায় রত এবং পৃথিবীতে তারা যাদের রেখে গেলেন তাদের নিয়তই সহায়তা দান করেন। তাদের মধ্যস্থতাসূচক প্রার্থনা হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য মহান উচ্ছ্বসিত সেবা। তাদেরকে আমাদের জন্য ও সমগ্র জগতের জন্য অনুনয় করতে বলতে পারি, আর তা আমাদের করাই উচিৎ।”

সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় প্রার্থনায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য রাখা যেতে পারে যেগুলি সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবধারাপূর্ণ হবে, যেমন দেশের মানুষের জীবনে শান্তি, উন্নতি কামনা করে, দেশের বিভিন্ন সমস্যা-সংকটে, সংগ্রামে, প্রার্থনার আয়োজন করা যেতে পারে; বর্তমানের করোনাভাইরাসের প্রার্থনা।

আভিলার সাধ্বী তেরেজার কথা: “সাধু যোসেফের কাছে কোন কিছুর জন্য প্রার্থনা ক’রে আমি প্রত্যাক্ষাত হয়েছি, তা আমি স্মরণ করি না।” সাধু যোসেফ যেভাবে কাঠ জোড়া লাগান তেমনি তিনি ভগ্ন হৃদয়ও জোড়া রাগাতে পারেন। *যে কোন বিপদে যোসেফের কাছে যাও! বালক হিসাবে যিশু নিজেই তার কাছে গেছেন।*

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ৯৫৬ নং অনুচ্ছেদ সিদ্ধগণের মধ্যস্থতা বিষয়ে বলে: “যারা স্বর্গে বাস করেন, তারা খ্রিস্টের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত হতে পেরেছেন বলে সমগ্র খ্রিস্টমণ্ডলীকে পবিত্রতায় দৃঢ় থাকতে সাহায্য করেন...তারা আমাদের জন্য স্বর্গস্থ পিতার কাছে অনুনয় করতে ক্ষান্ত হন না। এই যে অনুগ্রহ তারা পৃথিবীতে থাকতে ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে একমাত্র মধ্যস্থতাকারী যিশু খ্রিস্টের মাধ্যমে লাভ করেছেন, তারা অন্যদের জন্য কামনা করেন। তাদের এই ভ্রাতৃসুলভ সাহায্যের দ্বারা আমাদের দুর্বলতা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়ে থাকে’। *‘তোমরা কেঁদো না, কারণ আমি মৃত্যুর পরই তোমাদের কাছে আরো বেশি সাহায্যকারী হব এবং মৃত্যুর পরই তোমাদের জন্য আমার সাহায্য বর্তমান সময়ের চেয়ে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে’। ‘আমি পৃথিবীতে ভাল কাজ ক’রে স্বর্গের সময় কাটাতে চাই।”*

মণ্ডলী আমাদের উপদেশ ও প্রেরণা দেয়: প্রতেকের নিজ নিজ প্রতিবন্ধকতায়/বাধায় যোসেফের কাছে যাওয়া উচিৎ। সাধু থমাস আকুইনাস লিখেন: “কোন কোন সাধুকে ঈশ্বর এমন ক্ষমতা দিয়েছেন যে, তারা আমাদের কোন কোন কষ্টে সাহায্য করতে পারেন কিন্তু সাধু যোসেফকে আমাদের আমাদের সমস্ত বিপদ হতে উদ্ধার করবার এবং যে কোন প্রকার কষ্ট দূর করবার শক্তি দিয়েছেন।” সেভাবে প্রতিপালক সাধু যোসেফের সকল ক্ষেত্রে, প্রয়োজনে, সাহায্য করার ক্ষমতা আছে। শিশুর মত ভক্তি নিয়ে সাধু যোসেফের নিকট প্রার্থনা করি।

আমরা তাই সবাই মনে প্রাণে ব্যক্তিগতভাবে, পরিবার প্রতিষ্ঠান হিসাবে, দলে তাঁকে বার বার তাঁকে ডাকি তিনি যেন আমাদের বর্তমান পৃথিবীর জন্য অনেক প্রার্থনা করেন আর মানুষের জীবন নিরাপদ থাকতে সাহায্য নিয়ে দেন। তিনি আমাদের জন্য অনেক কিছু করতে পারেন। তিনি বর্তমান সংকটময় বাস্তবতায় তাঁর পুত্রের কাছে আমাদের পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য অনেক প্রার্থনা করতে ও তাঁর দয়া সুস্থ্যতা নিয়ে দিতে পারেন-পৃথিবীকে সুস্থ্য-সবল, আশায় পূর্ণ করতে পারেন। আমরা তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর স্মরণাপন্ন হয়ে নিরাশ না হয়ে ধৈর্য ধরে ভাইরাস আক্রান্তদের জন্য অনুনয়ের স্বরে বার বার বলি: “রোগীদের আশা” সাধু যোসেফ, আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করো। আর এভাবেই প্রতিবেশীদের ভালবেসে বিশ্বজনীন মণ্ডলীতে প্রার্থনার সক্রিয় অবদান রাখি। আর তিনি আবশ্যই আমাদের মধ্যস্থতাকারী হয়ে কাজ করবেন। “রোগীদের আশা” সাধু যোসেফের নিকটে প্রার্থনা কখনো বৃথা হয় না। তাঁর সরল সাধারণ আচরণ, কষ্ট, বিশ্বাসপূর্ণ জীবন তাঁর প্রার্থনা কার্যমণ্ডিত করেছে। তিনি ঈশ্বরের কাছ থেকে কৃপা নিয়ে দেন যেন তারা অসুখের কষ্ট-যাতনা সহ্য করতে পারে, তাদের আত্মাকে স্বাস্থ্যবান ক’রে তুলতে পারে, যাদের মৃত্যু সন্নিকট তারা যেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে পারে এবং স্বর্গ সুখের বৃদ্ধি করতে পারে। আমরা যা চাই তা না পেলেও গভীর ভরসায় থাকি, তিনি আমাদের প্রয়োজন জানেন ও বুঝেন, তাই তিনি আমাদের প্রার্থনার অপেক্ষাও মূল্যবান অনুগ্রহ নিয়ে দিতে পারেন। সাধু যোসেফের বছরে তার মধ্যস্থ্যতায় প্রার্থনা করার এ ধারা ও অভ্যাস বাড়তে থাকুক এবং তা সবার মধ্য নিয়মিতভাবে আচরিত হলে অনেক ফল আসবে। **(চলবে)**

আদিবাসী দিবস নিয়ে আমার ভাবনা

সত্যরাং ত্রিপুরা

বর্ষ পরিক্রমায় ঘুরে ফিরে আমাদের দ্বারপ্রান্তে আবারও এসেছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেই মহা "আদিবাসী দিবস"-২০২১ খ্রিস্টাব্দ। প্রতিবছর ৮ই মার্চ, "বিশ্ব আদিবাসী দিবস" কে যথাযথভাবে পালন করা হয়ে থাকে। বিশ্ব আদিবাসী দিবসে সকল স্তরের মানুষ, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকগণকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও সাধুবাদ। এ মহান দিবসে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকগণের মহামিলনে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরের রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠবে এটা সহজেই অনুমেয়।

আজকের এই ঐতিহাসিক মহান আদিবাসী দিবসের দিনে সকল অভিভাবক, ছাত্রসমাজ ও সমাজের সকল স্তরের মানুষের বিশেষ করে শিক্ষিত মহলকে ভবিষ্যতে সমাজকে কল্যাণের পথে অগ্রগতির গন্তব্যে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে এবং সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্যে আমাদের চিন্তা ভাবনা করার সময় এসে গেছে। আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলের ত্রিপুরা সমাজে নেই কোন সরকারী বেসরকারী অফিস আদালতের কর্মকর্তা, নেই কোন উপযুক্ত জনপ্রতিনিধি, মেম্বার, হেডম্যান, চেয়ারম্যান এবং ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কোন উপদেষ্টা। এমতাবস্থায়, আমাদের এই দক্ষিণ অঞ্চলের সমাজের যাত্রাটা যেন মাঝি বিহীন তরীর মত যাচ্ছে। হাল ধরার মত যেন কেউ নেই। আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই কোন সমঝোতা, নেই কোন ঐক্যমত্য। শিক্ষিতদের ক্ষেত্রে হোক আর নিরক্ষরদের ক্ষেত্রে হোক প্রায়শই পরিলক্ষিত হয় ভেদ-বিভেদ ও দ্বন্দ। এভাবে কোন সমাজ, জাতি চলতে পারে না। এই গন্ডী থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। একজন মনীষি একটি সুন্দর কথা বলে গেছেন। হয়তো তিনি কথাটি ক্ষোভে কিংবা দুঃখের কারণে বলেছেন।

তিনি বলেছেন যে, "Man can make a wall between man, but cannot make a bridge". অর্থাৎ একজন মানুষ আর একজন মানুষের মধ্যে বিভেদ বিচ্ছেদ এবং দ্বন্দ বাঁধানোর জন্যে দু'জনের মাঝখানে দেওয়াল তৈরী করতে জানে, কিন্তু, ভাল ও সুসম্পর্ক গড়ে তুলার জন্য সেতুবন্ধন তৈরী করে দিতে জানে না। আমাদের সমাজের শিক্ষিত-নিরক্ষর মানুষের বেলায় প্রযোজ্য বলে মনে করি। এ চরম অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসা খুবই প্রয়োজন। এ অভিশাপ থেকে বেরিয়ে আসতে হলে লেখা পড়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আমাদের সমাজকে উচ্চতর লেখাপড়ায় উদ্যোগী হতে হবে। বর্তমানে দক্ষিণ অঞ্চলের ত্রিপুরা নারীদের মধ্যে মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া নেই বললে আমার মনে হয় অতুক্তি হবে না। নারীরা বোধ হয় মনে করে যে, স্বামীরা খাওয়াইলে খাই, না খাওয়াইলে নাই। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে স্বামীকে সহযোগীতা করবে এই মনমানসিকতা কম। তাই নারীরা প্রায়ই দেখা যায়, এসএসসি পযর্ন্ত কোন রকম পাড় হলেই ঝড়ে যায়। এজন্য নারী সমাজকে নেপোলিয়ানের উক্তি স্মরণে রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ করি। তিনি বলেছেন, " তোমরা আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।"

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামও নারী সমাজকে সচেতন ও জাগ্রত করার লক্ষে বলেছিলেন, "এ দুনিয়ায় যত সুন্দর ও কল্যাণকর, অর্ধেক তা গড়িয়াছে নারী, অর্ধেক তা নর।" তাই আমিও বলতে চাই, দক্ষিণ অঞ্চলের ত্রিপুরা নারী সমাজকে যে,

"হে ত্রিপুরা নারী সমাজ,
তোদের কি নেই কোন লাজ?
নেই কি উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার অভিলাষ?"

এবার আমি ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি আমার একটি প্রস্তাব সবিনয়ে অনুরোধ করে যেতে চাই। জানি না কতটুকু গ্রহণীয় হবে! আমরাতো এখন সবাই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাস্টার্স ডিগ্রির জন্য ব্যস্ত। কিন্তু এ পযর্ন্ত আমি কোন ত্রিপুরা ছেলে বা মেয়েকে কৃষি কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কৃষি ডিপ্লোমাতে অধ্যায়ণ বা লেখাপড়া করতে শুনিনি বা দেখিনি। এই শিক্ষাও আমাদের সমাজ সময়ের দাবীতে খুবই জরুরী এবং প্রয়োজন মনে করি। কারণ স্মরনাতীত কাল থেকে আমাদের পিতা-মাতারা জুম চাষকে প্রধান পেশা হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছেন বিধায় কৃষি শিক্ষাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। পূর্বে অর্থাৎ চল্লিশ বা পঞ্চাশ দশকের সময় পাহাড়ে জুম চাষ করে খুবই লাভবান হত এবং বছরে খেয়েদেয়ে খোরাকী আরও ঘরে অবশিষ্ট ধান, চাউল জমা থাকত। কিন্তু বর্তমানে আমাদের পাহাড়ীদের জীবনযাত্রায় খুবই নাজুক অবস্থায় অতিক্রম হচ্ছে। ৩০/৪০ হাড়ির পরিমান জুম চাষ করলেও বছরে খোড়াকী হয় না। জুমের ধান কাটা শেষ, পরিবারের খোড়াকীও শেষ। ফলে বাজারের চাউলের উপর নির্ভর করে সংসার চলতে হয়। এ ধরণের অবস্থা আমাদের কেন হয়? কারণ, হয়তো বা কৃষি জ্ঞানের তীব্র অভাব। কোন মাটিতে কোন ধরণের সার প্রয়োগ করতে হবে কি পরিমান সার দিতে হবে এবং কোন কীটনাশক ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে কোন ধারণা নেই। এছাড়াও কোন ধরণের মাটিতে কোন ফসল উপযুক্ত সেটাও আমাদের অজানা। কাজেই আমাদের ত্রিপুরা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে কৃষি বিষয়ে ভাল জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা থাকলে আমাদের জুম চাষী পিতামাতা ও ভাইবোনদের জন্য সহায়ক হবে বলে আশা করি। এছাড়াও বর্তমানে দক্ষিণ অঞ্চলের ত্রিপুরাদের যাদের অল্পবিস্তর চাষাবাদযোগ্য ধানের জমি রয়েছে সেই সকল কৃষকদেরও হয়তো কৃষি সম্পর্কে তেমন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নেই। যার কারণে আশানুরূপ ভাল ফল পায় না বিধায় দিনকে দিন অনীহা এবং বৃথা শ্রম করে যাচ্ছে। অন্যদিকে অপাহাড়ীরা দুই এক বিঘা জমিতে তুলনামূলক ভাবে অনেক ভাল ফল পাচ্ছে। তাই অদূর ভবিষ্যতের জন্য কৃষি শিক্ষার বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে চিন্তা ভাবনা করার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানাই॥

বি.দ্র লেখক প্রয়াত হয়েছেন গত ১৪জুলাই, ২০২১

প্রবীণ দিবস : একটি অনুচিন্তন

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রবীণ হইবে! তখন তোমার/তোমাদের অহম, বাড়াবাড়ি, সফলতার বাহবা এগুলো দিয়ে কী হইবে?" অতএব এই প্রবীণ দিবসে নতুন মনোভাব নিয়ে প্রবীণদের সাথে সুন্দর, সন্মানপ্রদ ও বিনয়ী আচরণ করি; তাঁদের শ্রদ্ধা করি, অর্জন করি প্রবীণদের স্নেহ-ভালবাসা, আশীর্বাদ।

গুরু-ভক্তি (respect for the elderly) এনে দেয় গুরুজনের আশীর্বাদ, গুরু যিশুর আশীর্বাদ এই গুরুজনদের মধ্যদিয়ে। আসুন, তাঁদের মাঝে যিশুকে দেখি। প্রত্যেক প্রবীণকেই সমান ভক্তি-শ্রদ্ধা করি: গ্রামে-গঞ্জে যিনি, চাকুরীজীবি যিনি, মণ্ডলীর পরিমণ্ডলে যিনি, যে-কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন: আসুন কোন বৈষম্য না করে, বড়-ছোট এমন ব্যবধান ঘুচিয়ে প্রত্যেক প্রবীণকে, দাদু-দাদী, নানা-নানীসম প্রত্যেক প্রবীণকে (জনগণ বা মণ্ডলীর পরিমণ্ডলে) সমানভাবে শ্রদ্ধা-ভক্তি করি, সম্মানের আসন দেই, সেবা-যত্ন করি এবং তা করি শুধু এই প্রবীণ দিবসেই নয়; তা করি দিন দিন প্রতিদিন!

ভক্তি-শুভেচ্ছা : ভক্তিভাজন ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, দাদা-দিদিমা /দাদু-দাদী, নানা-নানী (যা-ই ডাকিনা কেন) এবং প্রবীণগণ, আপনাদের প্রতি আমাদের সবার ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং প্রবীণ-দিবসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দীর্ঘজীবি হউন আপনারা! May you stay safe and live long!

ঊনত্রিশে মে

সাগর কোড়াইয়া

ঝুসার সাথে দেখা হবে কখনো ভাবিনি। ঝুসা ওর আসল নাম নয়; ছদ্ম নাম। দেখা তাও আবার এতবড় অনুষ্ঠানের ভীড়ে! চারিদিকে শুধুই মানুষ। তবু কি করে যে চোখটা ঝুসার দিকেই গেল জানি না। সারপ্রাইজ দিবে কি আমি নিজেই সারপ্রাইড হয়ে গেলাম!

আধুনিকতার বদৌলতে যোগাযোগটা ছিলো তবে এভাবে দেখা হবে তা ছিলো কল্পনার বাইরে।

ঝুসাকে দেখার পর নিজের মধ্যেকার উপলব্ধিটা ভাষায় প্রকাশ দুঃসাধ্য। কবিতায় কবিরা প্রকাশ করতে পারে তবে আমার জন্য কষ্টকর কাজই সেটা। সন্ধ্যা তখন নেমে এসেছে চত্বরে। বৈদ্যুতিক লাইটের নিয়ন আলোয় ঝুসা যেন এক টুকরো চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করছিলো। চোখ জুড়িয়ে যাবার মতো!

জীবনের এতটা বসন্ত পাড় করে এলেও ঝুসাকে দেখে যে উপলব্ধি তা এই প্রথম বুঝেছি। সুর যে আপনি এসে সংযোজিত হয়ে বসে আছে তা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম। তবে হয়তোবা এক পাক্ষিক- এই ভাবনায় সুর বিচ্ছিন্ন হবার সম্ভাবনাটাও উড়িয়ে দেবার নয়।

যাই হোক- এগিয়ে গেলাম। বুক ঢিপ ঢিপ করছিলো স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। বুকে হাত দিয়েছিলাম কিনা মনে পড়ছে না। **চোখে** চোখ পড়তেই আবিষ্কারের নেশাটায় কেমন আছ জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেলাম। কথা হলো অল্প-বিস্তর। তাও আবার অপ্রাসঙ্গিক। আমি সচারাচর অপ্রাসঙ্গিক কথার মানুষ না; তবু অপ্রাসঙ্গিকতাই আমার মধ্যে ভর করেছিলো।

সে যাই হোক- হঠাৎ দেখার মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা অন্তরে গেঁথে নিলাম।

পরদিন দুপুরে শুয়ে আছি। মোবাইলটা বেজে উঠলো। বিরক্ত হলাম বেশ! চোখটা কেবল লেগে এসেছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধরলাম। অপরিচিত নাম্বার।

হ্যালো বলতেই ওপার থেকে ঝুসার কণ্ঠ, কি করছিলে?

ঘুমিয়ে ছিলাম।

তাহলে রাখি বিরক্ত করলাম।

সহজে কি আর বলতে পারি- বিরক্ত বৈ হয়েছিলাম; কিন্তু এখন নয়।

কথার ফাঁকে বিকালের চা-নাস্তা খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালো ঝুসা। এক কথায় রাজি হয়ে গেলাম।

কথা শেষ করে আবার লম্বা ঘুম। বিকাল চারটায় ঘুম ভাঙ্গলে বাইরে এলাম। আকাশ কালো হয়ে আছে। চারিদিক অন্ধকার। যে কোন সময় মেঘ আসতে পারে। ঝুসাদের বাড়ি যাবো কি যাবো না ভাবতেই ঝুপঝাপ চরম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। ঘরে এসে দেখি ইতমধ্যে মোবাইলে ঝুসার চারটি কল।

কলব্যাক করতেই ঝুসার কথা, ছাতা নিয়ে চলে এসো!

আজ্ঞা শিরধার্য করে ছাতা মাথায় বেরিয়ে পড়লাম। তখনও আকাশ ফুঁড়ে তমুল বৃষ্টি বাইরে। ছোটবেলায় এ রকম বৃষ্টি হলে মানকচু নয়তো কলাপাতা মাথায় বেরিয়ে পড়তাম। মাথাটা কোন রকম বৃষ্টি থেকে বাঁচতো কিন্তু পিঠ থেকে পা পর্যন্ত ভিজে একাকার।

নদীর ধারে এসে দেখি এ এক অন্য রকম পরিবেশ। কোন মানুষজন নেই রাস্তায়। ব্রিজটা একলা দাঁড়িয়ে ভিজছে। ব্রিজে উঠলাম। নদীতে যতটুকু জল আছে বৃষ্টির স্পর্শ পেয়ে খুশিতে আত্মহারা। ইচ্ছে হলো নদীতে হাঁটু জলে নেমে পড়ি। ইচ্ছাটাকে নদীর জলে বিসর্জন দিয়ে এগিয়ে গেলাম।

ঝুসাদের বাড়ি পৌঁছানোর পরও প্রচণ্ড বৃষ্টি। মনে হলো আরো বেড়েছে। ইতোমধ্যে আমার শরীরের একাংশ ভিজে একাকার। আমি নিশ্চিত জ্বর-সর্দিতে ভুগতে হবে। ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই ঝুসা ফ্যান চালু করে দিলো। যদি শুকিয়ে যায়।

বসলাম। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। জিজ্ঞাসা করতেই জানালো, বাড়িতে কেউ নেই। বৃষ্টি আসার কিছুক্ষণ পূর্বেই মাত্র বের হলো সবাই। ঝুসা বাড়িতে একা।

ফিরে আসবো ভাবছি। ঝুসা হয়তো বুঝতে পেরে বললো, দুধ চা আর চিড়া ভেজেছি। এই বৃষ্টিতে খেতে বেশ লাগবে। বসো নিয়ে আসছি। ঝুসা রান্না ঘরে চলে গেল।

আমি বাধ্য ছাত্রের মতো বসে আছি। টিনের চালে বৃষ্টির প্রচণ্ডভাবে ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনছি অনেকদিন পর। শুনতে ভালো লাগছে। আমাকে কেমন যেন নস্টালজিয়ায় পেয়ে বসে। এমন বৃষ্টি এলে কি যে মজা হতো! স্কুলে যাওয়া বন্ধ। আর স্কুলে গেলেও ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি কম হলে ক্লাস হতো বললেই চলে। বাড়িতে সেদিন খিঁচুড়ি রান্না হবে নিশ্চিত। সাথে বেগুন-আলু-মাছ ভাজা আর চ্যাপার ভার্তা থাকবেই। অতিরিক্ত হিসাবে পেঁয়াজ-মরিচ তো আছেই। আকাশে মেঘ গুরুম-গুরুম ডেকেই চলতো সারাদিন। বাড়ির পাশে যে উঁচু জমি সেখান থেকে বৃষ্টির পানি গড়িয়ে পড়তো ডহরে। কাপড় পেতে রাখলেই ছোট ছোট সোনালী রূপচাঁদা, পুঁটি আর কৈ মাছের পোনায় কাপড় ভরে উঠতো।

ঝুসার ডাকে সম্বিত ফিরে এলো। হাতে একবাটি চিড়ে ভাজা আর কাঁচের গ্লাসে দুধ চা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে ঝুসা।

খাচ্ছি আর গল্প জমে উঠেছে! যত রাজ্যের গল্পের ঝুলি খুলে বসেছে ঝুসা। বৃষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ওর গল্প যেন শেষই হতে চায় না। ঝুসাকে এই জন্যেই আরো বেশি ভালো লাগে। মনের ভেতর কোন জটিলতা নেই। অবলীলায় প্রগলভ বলে যেতে পারে। লুকোচুরি নেই কথার ফাঁকে।

বুঝতে পারলাম বাহিরে বৃষ্টি ধরে এসেছে প্রায়। সন্ধ্যা হতে বাকি নেই। উঠবো ভাবছি। সেই সময় ঝুসার সেই মধুমাখা প্রশ্নবাণ ধেয়ে এলো, তোমার আবদার কি পূর্ণ করবে না!

ঝুসার কথা বুঝতে পারলাম না। প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝুসার চোখের দিকে তাকাই। কোন উত্তর খুঁজে পাই কিনা দেখছিলাম। ঝুসা একদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

ওর তাকানোতেই সব উত্তর লুকানো। আমার বুকটা তখন ধুক ধুক করে কাঁপছে। বুঝতে পারলাম- আমি আর ঝুসা খুব কাছাকাছি। হাতে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছি। একবারের জন্যেও আমাদের কারো দৃষ্টিক্ষেপ হয়নি। ঝুসার চোখের তারায় কয়েক মূহুর্ত হারিয়ে গিয়েছিলাম। ঠোঁটের ভাষা ভাষাহীন হয়ে অন্য এক ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিলো।

ঝুসার কানের কাছে ঠোঁটজোড়া নিয়ে আস্তে বললাম, এবার ফিরতে হবে।

মুষল ধারে বৃষ্টি শেষ। ঝিরিঝিরি কয়েক ফোঁটা পড়ছে। ফিরে আসার সময় রাস্তার দু'পাশে তখন বৃষ্টির পানি জড়ো হয়ে গিয়েছে। হলুদ ব্যাঙগুলোকে দেখি মনের সুখে জলকেলীতে মত্ত! আজকের তারিখটা মনে করতে চেষ্টা করলাম- স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মনে পড়লো- ঊনত্রিশে মে। আষাঢ় মাস শুরু হয়েছে। এখন থেকে বৃষ্টির ফোঁটায় সময় কাঁটবে বেশ। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জল এসে হাতে পড়লো- ঝুসার স্পর্শ অনুভব করলাম॥

খাসিয়া আদিবাসীদের কান্না

ম্যাক্সিমিলিয়ান রাবণ

ভূমিকা : বহু জাতির, বহু সংস্কৃতির এবং ভিন্ন-ভিন্ন ভাষার বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাবেশ এই দেশ বাংলাদেশ। এই দেশে আবহমান কাল থেকে বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ বসবাস করে আসছে। এই সব জাতি স্বকীয় এবং সমৃদ্ধ ভাষা, সংস্কৃতি, রীতিনীতি, ধর্ম-মূল্যবোধ, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি এবং এই দেশের বৃহত্তর বাঙালি জাতির সাথে স্বতন্ত্রতা বজায় রেখে যুগ-যুগ ধরে বসতি স্থাপন করছে। তবে এই দেশে আদিবাসী জাতি গোষ্ঠীর পথ চলা তেমন সুখকর বলা যাবে না। পদে পদে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং বিভিন্ন সমস্যাবলির সাথে সংগ্রাম করে তাদেরকে টিকে থাকতে হয়। খাসিয়া এই দেশে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম একটি ক্ষুদ্র এবং অসহায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী যারা টিকে থাকার লড়াইয়ে তথাপি ভূমির অধিকার লাভের জন্য প্রতিনিয়তই সংগ্রাম করে যাচ্ছে ও করছে।

খাসিয়া জাতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং বর্তমান অবস্থা : খাসিয়া হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিসত্তা যারা ভারতের মেঘালয় এবং বাংলাদেশের সিলেট বিভাগের বিভিন্ন অঞ্চলে ঐতিহাসিক কাল ধরে বসবাস করে আসছে। বাংলাদেশে অবস্থানরত খাসিয়ারা সিলেট জেলার জাফলং, গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, জায়ন্তিয়া, হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট, বহুবল, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল, রাজনগর, কুলাউড়া, কমলগঞ্জ, জুরি, বড়লেখা প্রভৃতি অঞ্চলের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পাহাড়ী বনভূমিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করছে। খাসিয়াদের প্রধান জীবিকা হচ্ছে পান চাষ। এছাড়াও লেবু, কমলালেবু, সুপারি, কলা, আনারস ইত্যাদি চাষ করে তারা জীবিকা নির্বাহ করত। সম্প্রতি কিছু সংখ্যক খাসিয়া শিক্ষিত হয়ে শহরে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পেশায় চাকুরী করছে। খাসিয়া নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, সামজিক ব্যবস্থা-রীতিনীতি, ধর্ম-মূল্যবোধ প্রভৃতির প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং যত্নশীল।

খাসিয়ারা সবুজ গাছ-গাছালি দ্বারা আচ্ছাদিত বনভূমি বা পাহাড়ী অঞ্চলে বাস করতে ভালবাসে। প্রকৃতিরই সাথে তাদের নিবির সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতির তাদের জীবন তাই তাদের চাল-চলন, স্বভাবের মধ্যে মনোরম প্রকৃতির মমস্পর্শী আভা খুঁজে পাওয়া যায়। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে খাসিয়া জাতির সুনাম আছে। তবে তারা জীবন যুদ্ধে পরাজয় মেনে নিতে নারাজ। জীবিকার তাগিদে প্রতিকূল পরিবেশের সাথে প্রতিনিয়তই সংগ্রামে লিপ্ত হয়।

বর্তমানে খাসিয়ারা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যায় জর্জড়িত। এই সকল চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহ তাদের সামগ্রিক উন্নতির অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে খাসিয়াদের সব প্রধান চ্যালেঞ্জ বা সমস্যা হচ্ছে ভূমি সমস্যা যা তাদের অস্তিত্বকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে।

ভূমি সমস্যা : খাসিয়াদের প্রধান চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ভূমি সমস্যা। বর্তমানে শতকরা ৭০ ভাগ খাসিয়াদের নিজস্ব কোন ভূমি নেই। ভূমিহীন খাসিয়ারা বিভিন্ন মালিকানাধীন জমিতে কিংবা দখলকৃত সরকারি খাস জমিতে এবং কিছু অংশ বনবিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বসবাস করছে। ভূমির মালিকানা আদায়ে তারা দীর্ঘদিন ধরে সংগ্রাম করে আসছে। কিন্তু সরকারী খাস জমির বন্দোবস্তকরণে বিভিন্ন সমস্যা, ষড়যন্ত্র, হয়রানী, মামলা-মোকদ্দমা প্রভৃতির কারণে ভূমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। খাসিয়াদের সরলতা এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবের সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বহিরাগত ভূমি দস্যুরা খাসিয়াদের জমি দখল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। সম্প্রতি কিছু স্বার্থান্বেষী লোভী ভূমি দস্যুরা খাসিয়াদের বসবাসকৃত এলাকা, চাষজমি, পানজুম ইত্যাদি জাল দলিল প্রদর্শন করে জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। বন বিভাগের তরফ থেকেও খাসিয়াদের বিভিন্ন হয়রানীর স্বীকার হতে হচ্ছে। এমন কি বন বিভাগের কর্মকর্তা এবং স্থানীয় প্রসাশনের সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রভাবশালী ভূমি লোভী ব্যক্তিরা খাসিয়াদের পান জুম ধ্বংস করে তা জোড়পূর্বক দখল করে নিচ্ছে।

ভূমির অধিকার : যেহেতু ভূমি সমস্যা হলো খাসিয়াদের প্রধান চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা তাই এই সমস্যা থেকে সমাধানের অন্যতম উপায় হচ্ছে খাসিয়াদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় ভূমির অধিকার নিশ্চিত করা। সরকারি খাসজমি বা চুক্তির দ্বারা ইজারাকৃত জমি খাসিয়াদের হাতে স্থায়ী বন্দোবস্তকরণে যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে আমলাতান্ত্রিক সহায়তা গ্রহণ করে তা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

খাসিয়াদের ভূমির অধিকার নিশ্চত করে তাদের সেইসাথে খাসিয়াদের বিরুদ্ধে হয়রানি বা ষড়যন্ত্রমূলক যে সমস্ত মামলা-মোকদ্দমা করা হয়েছে তা প্রতিহত করতেও ঐ কমিশন সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। ভূমি সন্ত্রাসীদের মূখোস উন্মোচন করে তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে দখলকৃত ভূমি খাসিয়াদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে।

সর্বোপরি, ভূমির অধিকার থেকে শুরু করে সকল সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। এই সমস্ত অধিকার নিশ্চত হলে পরে সকল অন্যায়, অবিচার দুর হবে এবং খাসিয়ারা স্বাধীন ও শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। সেই সাথে দেশের কল্যাণে তারা যথাযথ অবদান রাখতে পারবে।

উপসংহার : সংখ্যালঘু খাসিয়ারা অসহায় এবং নিরুপায়। এদেশে তারা জন্ম গ্রহণ করে, এদেশের আলো-বাতাসে বেড়ে উঠে, এই দেশকে আপন করে ভালবাসার পরেও তারাই আজ এদেশের মাটিতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে এবং পরবাসীর মত জীবন-যাপন করছে। যতদিন খাসিয়াদের ভূমি সমস্যা সমাধান হবে না, ততদিন এই দেশে তাদের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পরবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা একান্ত আবশ্যক॥

আর্থিক শিক্ষা : জীবন পরিচালনার এক অপরিহার্য দক্ষতা

জনাথ্যান গমেজ

সাঁতার না শিখেই আমরা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি না। কিংবা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না নিয়ে আমরা রাস্তায় গাড়ী চালাতে নেমে যাই না। একটা ছোট্ট ভুল হলে অনেক বেশি মূল্য দিতে হতে পারে এমন কোনো বিষয় ভালোমতো বুঝে নিয়ে তবেই আমরা সে কাজে হাত দিয়ে থাকি। এভাবেই আমরা নিজেদের ভালো-মন্দ, সুবিধা-অসুবিধা, লাভ-ক্ষতি বুঝে নিতে শিখি।

ন্যূনতম শিক্ষা, নির্দেশনা ও পরামর্শ পেলে জীবনের অনেক ব্যবহারিক ও বাস্তবমুখী বিষয়ে আমরা বড় ধরণের ভুল করা থেকে বিরত থাকতে পারি। বেঁচে যেতে পারে আমাদের মূল্যবান সময় এবং সম্পদ। অথচ হাতেকলমে শেখা হয়নি বলে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েই আমরা হেলায় সুযোগ হারাই। কখনো অপূরণীয় ক্ষতির শিকার হই, কিংবা অনাকাঙ্খিত কোনো দায়ে বোঝাগ্রস্থ হয়ে পড়ি।

কিছু মানুষ নিজের চেষ্টায়, সফলদের পরামর্শ নিয়ে, বই পড়ে, অন্য কাউকে দেখে কোনো কোনো বিষয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে নেয়। আবার কেউ কেউ কেবল সৌভাগ্যবশত পারিবারিকভাবে, শুভাকাঙ্ক্ষিদের সাহচার্যে অথ বা পারিপার্শ্বিক পরিবেশগত কারণে গুরুত্বপূর্ণ এসব বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠেন।

আর বাকি'রা বেশিরভাগই ভুল করে, অর্থাৎ ঠেকে শিখি। কিন্তু শেখা হলেও ইতোমধ্যে হয়ে যাওয়া ভুলের মাশুল গুনতে হয়- কখনো কখনো বেশ চড়া দামে। ততদিনে যে সময়টুকু পার হয়ে গিয়েছে তা হারানোর খাতায়ই লেখা থেকে যায়। সেটা ফিরে পাওয়া যায় না কখনোই। আর তাইতো অনেককেই সেই চিরচেনা সুরে আফসোস করতে শোনা যায়- "আগে যদি এটা জানতাম.....", "কেউ যদি আমাকে আগে একটু সাবধান করতো....", ইত্যাদি।

এ ধরণের ব্যবহারিক ও বাস্তবমুখী শিক্ষার বিষয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হলো আর্থিক শিক্ষা। ব্যক্তিগত অর্থ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শিক্ষা ও সচেতনতা। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রত্যেককেই দৈনন্দিন এই বিষয়টির ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে হয়। দিনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রায় সমস্ত কাজকর্মের সঙ্গেই কোনো না কোনো আঙ্গিকে অর্থ ও আয়-ব্যয়ের বিষয়টি জড়িত থাকে। আমাদের খাওয়া-পরা, যাতায়াত, যোগাযোগ, পরিবারের নিত্যনৈম্যত্তিক প্রয়োজন মেটানো, শখ-আহ্লাদ পূরণ, সামাজিকতা রক্ষা, আবাসন, শিক্ষা, চিকিৎসা -- এই সবকিছুর সঙ্গেই রয়েছে আর্থিক সম্পর্ক।

ব্যক্তিগত অর্থ-ব্যবস্থাপনা নিঃসন্দেহে এমনই একটি বিষয় যা সকল পেশার, সব ধর্মের, সব বয়সের, সকল আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষের সার্বিক স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এই বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা সমাজের সকলের জন্যই দরকারী ও কল্যাণকর।

আর্থিক সাক্ষরতা ছাড়াই আমরা উপার্জন করতে শুরু করি সঞ্চয় সম্পর্কে কিছু না জেনে। ব্যক্তিগত আর্থিক পরিকল্পনা ও ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি অনেক দেরিতে। ঋণ সংক্রান্ত দায় এবং তার পরিণতির ব্যাপারে অসচেতন থাকি। অনাকাঙ্ক্ষিত ও আকস্মিক খরচের জন্য জরুরি-তহবিল গড়ে তুলি না। এমনকি অনিয়মিত কিছু খরচ থাকে যেগুলো জানা সত্ত্বেও তার জন্য প্রস্তুতি নেই না।

এই ধরণের "ব্যয়বহুল" ভুলগুলো অতি সহজেই এড়ানো যায় পর্যাপ্ত আর্থিক সাক্ষরতা বা ব্যক্তিগত অর্থ-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষার মাধ্যমে। আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও তাদের সেবাসমূহ, ঋণের প্রকৃত মূল্য, চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ, বিনিয়োগের ঝুঁকি, সুপরিকল্পিত আর্থিক ব্যবস্থাপনা কৌশল, ইত্যাদি সম্পর্কে খুব সাধারণ শিক্ষাও আমাদের অনেক উপকারে আসতে পারে। সাহায্য করতে পারে আমাদের কষ্টার্জিত আয়ের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে।

এছাড়া অভ্যাসগত কারণে প্রতিনিয়তই অনায়াসে যেসব কাজ করি, সেগুলোও আমাদের আর্থিক পরিস্থিতির ওপর পরোক্ষ প্রভাব রাখে। এক্ষুনি না হলেও দীর্ঘমেয়াদে প্রভাব ফেলে। আমাদের খাদ্যাভ্যাস, শরীরচর্চা, দীর্ঘদিন যাবৎ কোনো স্বাস্থ্যকর কিংবা অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস ধরে রাখা, মানসিক সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি নির্ধারণ করে মধ্যবয়স ও বৃদ্ধবয়সে আমাদের জীবনধারণের ব্যয় কেমন হবে। অবসর সময়টুকু আমরা ঘুমিয়ে, টিভি বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিনোদন খুঁজে, নিরর্থক আড্ডা দিয়ে, উদ্দেশ্যহীন কাজে ব্যয় করছি -- নাকি বই পড়ে, প্রিয়জনদের সাথে সময় কাটিয়ে, কোনো বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে, কোনো নতুন দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে আরো সমৃদ্ধ করে, অর্থপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপন ও তা পরিচর্যা করে গঠনমূলকভাবে নিজের সময় বিনিয়োগ করছি - এগুলো নির্ধারণ করে দেয় আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপার্জন ক্ষমতা।

আর্থিক শিক্ষা কোনো বিলাসিতা নয়, এটি একটি প্রয়োজনীয়তা। এই শিক্ষা শুরু হতে পারে পরিবার থেকেই, ছোটবেলা থেকে সন্তানদের মধ্যে আর্থিক সাক্ষরতা প্রদানের চেষ্টা করতে পারেন বাবা-মা। শিক্ষকেরা ব্যবহারিক পাঠ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এ বিষয়ে ধারনা দিতে পারেন। সামগ্রিক প্রচেষ্টায় আর্থিক শিক্ষাকে আমরা সকলের জন্য সহজলভ্য করে তুলে আগামী প্রজন্মকে উপহার দিতে পারি সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ার হাতিয়ার॥

এক কালো অধ্যায়

জেসিকা লরেটো ডি' রোজারিও

জীবনের পরাজয় দেখেছো?
দেখেছো বেঁচে থাকার এক অদম্য প্রচেষ্টাকে?
নিমিষেই যেন সুখের সাজানো পৃথিবী ঘূর্ণিঝড়ে
সর্বগ্রাসী এক ঘূর্ণিপাকে।
দেখেছো কখনো ক্লান্ত পৃথিবী শ্বাসরুদ্ধ হত?
প্রকৃতিও প্রতিশোধের নেয় বাক্‌রুদ্ধ বেশে।
যুগান্তরীরা গৃহবন্দী আজ, অচেনা এক ভয়ে
পালিয়ে বাঁচার আশা। যাবে কতদূর কোথা?
বিধাতা জানে পূর্ণ হয়েছে তোমার পাপের খড়া
নেই মুক্তি খুব সহজেই, নিশিথ অমানীশা।
ইতিহাস সাক্ষী কালজয়ীদেরও হেরে যেতে হয়
অশ্রুভেজা আত্মগ্লানি হাহাকারে ভরে গেছে হৃদয়
দেখেছো এক সাজানো সংসারে
মৃত্যু কি করে ঢোকে?
যেমন কাপড়ের ভাজে আটকে থাকো
চোরাকাঁটা রয় বিধে...
শত সহস্র পেরিয়ে পৌঁছে লক্ষকোটির কাছে
তবু এই অশরীরী ছায়াময় হাঁটে পিছু-পিছু
দেখেছো কখনো ভয়ানক এক অভিশাপ?
যেমন সাপের কণা ওৎ পেতে রয় শিকারের তবে-
অশরীরী আজ মৃত্যুপুরীতে অভিশাপ দেয় তারে
সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ যা ধ্বংস করেছে রক্ষা করিবার তরে
শ্বাস-প্রশ্বাসেই মৃত্যু তোমার কিসের নেশায় মত্ত
সর্বগ্রাসী সর্বনাশা, ধ্বংস নিশ্চিত পূর্বশর্ত
দেখেছো ভুলে যেতে রক্তের টান? আত্মার অটুট বন্ধন
দেখেছো সব মাতাল চোখে, থেমে যায়নি ছন্দপতন
এই ক্রোধ তখনি শান্ত হবে, প্রায়শ্চিত্ত হলে
সত্যিই কি অনুতাপে অনুরাগে সব মুক্তি মেলে?
বারবার হৃদয় ভেঙেছে কান্নায়, প্রিয় হারানোর বেদনায়
পৃথিবী পেয়েছে প্রাণ ফিরে শ্রেষ্ঠগৃহ বন্দী হওয়ার
ধিক্কার তোমার শ্রেষ্ঠ তুমি, তুমিই এক উপমা
রূপক তুমি, মৃত্যু তুমি, অভিশাপ্ত তুলনা।
কেড়েছো হাজার স্বপ্ন তুমি, এনেছো তার প্রতিকার
একহাতে মৃত্যু তোমার অন্যাতে উপায় বাঁচার।
মুক্ত কভু হবে কি মুক্ত, ভেবেছো কখনো কবে,
দু'হাত হোক এক তবে, শির হোক নিচু
অশরীরী ধ্বংস হবে রইবেনা আর কিছু।
শেষ হবে এক কালো অধ্যায়, প্রায়শ্চিত্ত হলে
ক্ষমা ভিক্ষায় অনুতাপে কি সব মুক্তি মেলে?

অনন্ত যাত্রায় সিস্টার মেরী সহায় এসএমআরএ

সিস্টার মেরী জুঁই এসএমআরএ

সিস্টার মেরী সহায় এসএমআরএ, বাপ্তিস্মের নাম ডেইজী মারীয়া গমেজ। পিতা স্বর্গীয় ভোলা গমেজ, মাতা স্বর্গীয়া শিশিলিয়া কস্তা। তিনি ১৯৪০ খ্রিস্টবর্ষে, ৫ এপ্রিল ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চড়াখোলা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত ১৯ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ সোমবার সকাল ৮টা ৩০ মিনেটে তুমিলিয়ার শান্তিভবনে এ পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহাঘুমে ঘুমিয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর ৩ মাস ১৫ দিন। তিনি ১৯৫৯ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জুলাই প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘে প্রবেশ করেন। ১৯৬২ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারী প্রথম ব্রত এবং ১৯৬৮ খ্রিস্টবর্ষের ৬ জানুয়ারী আজীবন ব্রত গ্রহণ করেন।

সেবাময় কর্মজীবন:

সেবার জীবনে ব্রতী হয়ে আদর্শ শিক্ষাগুরু যিশুর অনুসরণে সিস্টার শিক্ষকতার মধ্যদিয়ে বহু মানুষের জীবনে শিক্ষার আলো জ্বেলে দিয়েছেন। বহু গুণে গুণান্বিতা সিস্টার মেরী সহায় সংঘের মধ্যদিয়ে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তিনি বাংলায় বি,এ অনার্স সহ এম, এ পাশ করেন এবং পরবর্তীতে বি,এড প্রশিক্ষণ নেন। বাংলা ভাষায় সিস্টারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। সিস্টার ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১০ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত ধরেণ্ডা, তেজগাঁও, রাঙ্গামাটিয়া, তুমিলিয়া, বনানী সেমিনারী, পানজোরা আশ্রমে থেকে শিক্ষিকা হিসেবে এবং মাণ্ডলীক কাজে তার উত্তম সেবা দিয়েছেন। সবশেষে বটমলী অনাথ আশ্রমে থেকেও অনাথ শিশুদের মাঝে তার মাতৃ হৃদয়ের ভালবাসাময় সেবা প্রদান করেছেন। ২০১০ খ্রিস্টবর্ষে মেরী হাউজে এবং ২০১৬ খ্রিস্টবর্ষের জানুয়ারী থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মাতৃগৃহের শান্তিভবনে থেকে রোগ যাতনা সহ্য করে তার বিশ্বাসী ও প্রার্থনাশীল সরল সাধারণ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে যিশুর প্রেমের সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

আধ্যাত্মিক ও মানবীয় গুণাবলী:

সিস্টার সহায় ছিলেন প্রার্থনাশীল ও ঈশ্বর নির্ভরশীল সন্ন্যাসব্রতী। "নিজেরে পুড়ায়ে প্রদীপ যেমন, আলো করে বিকিরণ, পরের সেবার তরে তেমনি প্রভু কর মোরে নিমগন"। এই বাণীর মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সিস্টার তার ত্যাগময়, প্রেমময় সেবা আমাদের সংঘের মধ্য দিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত জনগণের মধ্যে বিতরণ করে গেছেন। তিনি ছিলেন নিরব কর্মী, ধীর-স্থির, শান্ত, প্রজ্ঞাময়, প্রার্থনাশীল, ত্যাগী, দরদী, মমতাময়ী, কর্মঠ, কষ্টসহিষ্ণু, নীরব এবং প্রজ্ঞাময়ী ব্রতধারিণী। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষিকা হয়ে বহু মানুষের হৃদয়ের মনিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন। সিস্টার তার প্রজ্ঞাময়, প্রার্থনাশীল, আধ্যাত্মিক জীবন ও সেবাময় কর্মজীবন দিয়ে আমাদের সংঘকে তথা বাংলাদেশ মণ্ডলীকে করেছেন সমৃদ্ধ। এসকল গুণাবলীর জন্য আমরা স্বর্গীয় পিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি এবং তা আমাদের জীবনে অনুকরণ করার কৃপা চাই।

মহাপ্রয়াণ:

সিস্টার মেরী সহায় পরম পিতার নির্ধারিত সকল কর্মপরিকল্পনা সাঙ্গ করে মা মারীয়ার ন্যায় নীরবে সকল দৈহিক যাতনা সহ্য করে সাক্রামেন্ত দ্বারা সবলীকৃত হয়ে মাতৃগৃহের সিস্টারদের উপস্থিতিতে পরম পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করেন। আমরা বিশ্বাস করি তিনি আজ তার সকল পুণ্য কাজের জন্য গরিমামণ্ডিত হয়ে পরম পিতার আবাসে তার সৌরব ছড়াচ্ছেন এবং আমাদের জন্য মঙ্গলাশিস বর্ষণ করছেন। সিস্টারকে হারিয়ে আমরা মর্মাহত, ব্যথিত কিন্তু পরপারের ভগিনীগণ আনন্দিত ও উল্লসিত। আমরা সিস্টার সহায় এর আত্মার চিরশান্তি কামনা করছি।

অন্তিম যাত্রায় সিস্টার মেরী যশোময়ী এসএমআরএ

সিস্টার মেরী খ্রীষ্টিনা এসএমআরএ

সিস্টারের সংক্ষিপ্ত জীবনী: ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে ১০ সেপ্টেম্বর ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধরেন্ডা ধর্মপল্লীর রাজাশন গ্রামের পিতা বাসি ইগ্নেসিয়াস রোজারিও ও মাতা নিলি মারীয়া কস্তার কোল আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেন সিস্টার মেরী যশোময়ী এসএমআরএ, যার বাপ্তিস্মে নাম ছিল মেরী পারুল রোজারিও। তিনি ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ৬ জুলাই এসএমআরএ সংঘে প্রবেশ করেন এবং ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী সংঘের পবিত্র পোষাক প্রাপ্ত হন। এরপর পরই তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের নব্যা অবস্থায় শিক্ষকতার কাজ করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী তিনি প্রথম ব্রত, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী আজীবন ব্রত, ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী রজত জয়ন্তী এবং ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারী সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেন।

সিস্টারের শিক্ষা ও কর্মজীবন: সিস্টার মেরী যশোময়ী ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের এসএসসি পাশ করে সংঘে প্রবেশ করেন অতঃপর ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ৬ বৎসর পর্যন্ত হলিফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে নার্সিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তুমিলিয়া ডিসপেনসারীতে নার্সিং সেবা শুরু করেন। তিনি পুনরায় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে মিডুইফারী ট্রেনিং গ্রহণ করেন।

অতঃপর ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ৪০ বৎসর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেন্ট পলস্ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ; তুমিলিয়া, রাঙ্গামাটিয়া, মির্জাপুর, শেলাবুনিয়া, নারিকেলবাড়ী, রানীখং,ও মরিয়মনগর নার্সিং সেবাদান করেন । হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীতে সেবাদানের পাশাপাশি বিভিন্ন আশ্রমের পরিচালিকা হিসাবে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর তিনি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ অবসরে যান। বার্ধক্য জনিত কারণে এক বৎসর মেরী হাউজে থাকার পর ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে তুমিলিয়ায় মাতৃগৃহ অর্থাৎ শান্তিভবনে আগমন করেন। ৬ বৎসর শান্তিভবনে অবস্থানের পর ১ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে দুপুর ১২টা ১৫ মিনিটে ৮১ বৎসর বয়সে পরম পিতার আশ্রয়ে গমন করেন।

সিস্টারের গুণাবলী: সিস্টার মেরী যশোময়ী এসএমআরএ, একজন সহজ সরল অত্যন্ত হাসিখুশী, সদালাপি, ধৈর্যশীল ও মিশুকে প্রকৃতির ব্রতধারিণী ছিলেন। তিনি অতি সহজে অন্যকে আনন্দ দিতে পারতেন, যে কোন পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেওয়া সিস্টারের একটি বিশেষ গুণ। তিনি ছিলেন হাস্যরসিক, নিজে হাসিখুশী থেকে অন্যকে আনন্দ দিতেন। তিনি অল্পতে সন্তুষ্ট থাকতেন, কোন অভিযোগ করতেন না এবং অতি সাধারণ জীবনযাপন করতে পছন্দ করতেন। তিনি ছিলেন প্রার্থনাশীল ও গভীর আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ একজন পরিপক্ক ব্রতধারিণী। সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন পজেটিভ মাইন্ডের ব্যক্তিত্বের অধিকারী এবং সুখী সিস্টার।

১ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে বিকেল ৫টায় তুমিলিয়ায় সংঘের মাতৃগৃহের চ্যাপিলে শ্রদ্ধেয়া সিস্টারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া খ্রিস্টযাগের পর সিস্টারদের সমাধিস্থানে সিস্টার মেরী যশোময়ী এসএমআরএ-কে সমাহিত করা হয়। আমরা সিস্টারের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করব।

বিজ্ঞ/০০০/২১

অলিম্পিক ২০২০, টোকিও, জাপান

অলিম্পিক হচ্ছে একটি আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যাকে বলা হয় "দ্যা গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ"। আজ থেকে প্রায় তিন হাজার বছর পূর্বে ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এর জন্ম হয়েছিল প্রাচীন গ্রীসে। প্রাচীন গ্রীসে দেবতা জিউসের আবাসস্থল অলিম্পিয়ার ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজের সাথে অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হত। মূলত প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিরাই এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত। সাধারণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে মলযুদ্ধ, ঘোড়াদৌড়, রথ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত। প্রাচীন বিভিন্ন লেখা থেকে জানা যায় যে বিভিন্ন নগর রাষ্ট্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও এই প্রতিযোগিতা চলাকালীন সময়ে তা স্থগিত থ াকতো। এই যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্বে সাময়িক বন্ধ হয়ে যাওয়কে "অলিম্পিকের যুদ্ধবিরতির নীতি" বলা হত। যদিও এই প্রাচীন ধারনাটি হয়তো একটি গল্পকথা কারণ গ্রীকরা কখনই যুদ্ধবিরতি করেনি। তবে এই রীতিটি অলিম্পিয়ামুখী তীর্থযাত্রীদের বিভিন্ন যুদ্ধরত নগর রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে অবাধে চলাচল করতে সাহায্য করতো। কারণ তারা মনে করতো যে জিউস সকল তীর্থযাত্রীদের সুরক্ষা করেন। অলিম্পিকের জন্ম আজও মানুষের কাছে একটি রহস্য এবং কিংবদন্তি আছে। তবে জনপ্রিয় একটি গল্পকথা মতে দেবতা জিউস এবং তার ছেলে হেরাক্লিস বা হারকিউলিস এই অলিম্পিক গেমসের জনক। এই গল্পকথার মতে হেরাক্লিসই এই অনুষ্ঠানকে অলিম্পিক নাম দেন এবং প্রত্যেক চার বছর পর পর এই গেমস অনুষ্ঠানের প্রচলন করেন।

প্রায় দুই শতাধিক দেশের অংশগ্রহণে মুখরিত এই অলিম্পিক গেমস বিশ্বের সর্ব বৃহৎ এবং সর্বোচ্চ সম্মানজনক প্রতিযোগিতা হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। অলিম্পিক গেমস প্রত্যেক চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এর দুটো প্রকরণ গ্রীষ্ম এবং শীতকালীন প্রতিযোগিতা প্রত্যেক দুই বছর পর পর হয়ে থাকে, যার অর্থ দাঁড়ায় প্রায় প্রাত্যেক দুই বছর পর পর অলিম্পিক গেমসের আসর অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীরা বিভিন্ন ধরনের খেলায় অংশগ্রহণ করে। খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দিতে প্রাচীন গ্রীসের অলিম্পিয়া থেকে শুরু হওয়া প্রাচীন অলিম্পিক গেমস থেকেই মূলত আধুনিক অলিম্পিক গেমসের ধারণা জন্মে। ১৮৯৪ খ্রিস্টের ব্যারন পিয়েদ্য কুবেরত্যাঁ সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি) গঠন করেন। এই আইওসি-ই অলিম্পিক গেমস সংক্রান্ত সকল কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ছাড়াও অলিম্পিক গেমসে আরও অন্যান্য আচার ও রীতি-রেওয়াজের প্রচলন রয়েছে যেমন অলিম্পিক মশাল, পতাকা, উদ্বোধনী এবং সমাপনি অনুষ্ঠান ইত্যাদি। গ্রীষ্ম এবং শীতকালীন অলিম্পিকে ৩৩ টি ক্রীড়ার ৪০০টি বিভাগে প্রায় ১৩,০০০ ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে থাকেন। প্রত্যেক বিভাগের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয়া স্থানাধিকারী ক্রীড়াবিদদের যথ াক্রমে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ব্রোঞ্জের পদক দেওয়া হয়।

অলিম্পিক সনদ অনুযায়ী অলিম্পিকের সকল গেমসে অলিম্পিকের মূলনীতি প্রতিফলনকারী প্রতীক ব্যবহার করা হয়। অলিম্পিকের প্রতীক যা বাংলায় অলিম্পিক বলয় বা অলিম্পিক নিশান হিসেবে পরিচিত। মূলত পাঁচটি বলয় একে অপরকে জড়িয়ে থাকে। পতাকার এই পাঁচটি বলয় আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া, ওশেনিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশকে নির্দেশ করে। পাঁচটি বলয়ের পাঁচটি রঙ নীল, হলুদ, কালো, সবুজ ও লাল চয়ন করার মূল কারণ হল এই পাঁচটি রঙের অন্তত যেকোন একটি বা একাধিক রঙ প্রত্যেক দেশের পতাকায় ব্যবহৃত হয়েছে। অলিম্পিকের এই পতাকাটি ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম গৃহীত হয় তবে বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্পে অনুষ্ঠিত ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ওড়ানো হয়।

অন্যান্য বারের ন্যায় এবারও "দ্যা গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ" অর্থাৎ অলিম্পিক গেমস ২০২০ খ্রিস্টাব্দে এর আয়োজন করা হয় নির্দিষ্ট জাপান এর টোকিও শহরে। করোনা ভাইরাসের জন্য এবার এর আয়োজন করা হয় সময়ের থেকে এক বছর পর অর্থাৎ পাঁচ বছর পর। করেনা ভাইরাসের জন্য এই প্রথম বার অলিম্পিক গেমস বন্ধ না করে পুনরায় এর সময় নির্ধারন করা হয়। এই বছর অলিম্পিক গেমস এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয় ২৩ জুলাই জাপানের নতুন নির্মিত জাতীয় স্টেডিয়ামে। করোনা ভাইরাসের জন্য অনেক সংখ্যক লোকের আগমন সম্ভব ছিল না তাই নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এর উদ্বোধন করা হয়। কিন্তু উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল অনেক জাঁকজমকপূর্ণ।

প্রতিবারের ন্যায় এবারও প্রায় ২০৬টি দেশের ১১৬৫৬ জন প্রতিযোগী অংশ নেয় এই অলিম্পিক গেমস ২০২০ আসরে। যেখানে বাংলাদেশের ৬ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। যারা বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। এবারের আসরে সব থেকে বেশি প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৬৫৭ জন আর দ্বিতীয় স্থানে আছে জাপান ৬১৫ জন প্রতিযোগী।

অলিম্পিক ২০২০ আসরে সব ইভেন্টস মিলিয়ে সর্বমোট স্বর্ণপদক দেয়া হয়েছে ৩৪০টি। যেখানে সবচেয়ে বেশি স্বর্ণ পদক অর্জন করে প্রথম স্থানে আছে যুক্তরাষ্ট্র ৩৯ টি, দ্বিতীয়তে আছে চায়না ৩৮ টি এবং তৃতীয় স্থান এ আছে জাপান ২৭টি স্বর্ণ পদক নিয়ে। সব ধরনের পদক মিলিয়েও সবার উপরে আছে যুক্তরাষ্ট্র ১১৩টি পদক ।

প্রায় ১৬ দিন ধরে চলে এই আসর। পরে ৮ আগস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে পর্দা নামে অলিম্পিক এর ২০২০ আসর টোকিও আসরের। সব মিলিয়ে ২০২০ অলিম্পিক ছিল খুব সুন্দর একটি আসর যেখানে অনেক গুলো দেশের সুন্দর অংশগ্রহণ দেখেছে সারা বিশ্ব। এই করোনা মহামারির সময়ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে সব প্রতিযোগী, আয়োজকগণ এবং অনান্য সকল ধরনের কমিটির সদস্যগণ নিয়ম শৃঙ্খলার সাথে আসর সম্পন্ন করে। সকল বিশ্ববাসীর আশাও পূরণ করে।

সব কিছু সুন্দর ভাবে শেষ হয় অলিম্পিক ২০২০ আসরের এরই সাথে এর পরবর্তী স্থান ঘোষনা করা হয়। ২০২৪ এর অলিম্পিক আসরের পর্দা উঠবে ফ্রান্সের প্যারিসে। সবাই আশাবাদী যে পরবর্তী আয়োজন হবে আরও সুন্দর এবং উপভোগ্য আর সবাই তখন স্টেডিয়ামে বসে খেলা দেখবে অর্থাৎ সবাই এই আশাই করে যে ২০২৪ এর আগেই করোনা মহামারি থেকে মুক্ত হবে এই বিশ্ব॥

ধরিত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতার সংস্কৃতি

জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনসহ নানা জায়গায় পূণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিসের বক্তব্য আমি গভীর মনযোগ দিয়ে অনুসরণ করি। ধরিত্রীর মানুষের জন্য তাঁর কথা বুকে বেশি বাজে। প্রায় সময় তিনি পরিবেশ, প্রকৃতি, ধরিত্রী, জীববৈচিত্র্য, টেকসই উন্নয়ন, মানুষের লোভ, প্রকৃতির প্রতি নিষ্ঠুরতা, অসমতা, ফেলাসিয়াস ইকোনমি ইত্যাদি নিয়ে কথা বলার সময় আদিবাসী মানুষের জীবনধারার প্রতি ইঙ্গিত করেন। গত বছর কঠিন করোনাকালে ধরিত্রী দিবস বা আর্থ ডে উপলক্ষে ১৩ এপ্রিল জনমানবশূণ্য সেন্ট পিটার্স স্কয়ারে পোপ মহোদয় আশীর্বাদের ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, We have sinned against the earth, আমরা ধরিত্রীর বিরুদ্ধে পাপ করেছি। তাঁর কথার মর্মার্থ হলো, প্রকৃতির উপরে সীমাহীন অত্যাচার মানুষের জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করছে। তিনি বিশ্ব নেতাদের সকলকে পরিবেশ বিপর্যয় রুখার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদের শুধু সতর্ক করেননি, সমাধানের পথ সন্ধানও দিয়েছেন। তিনি প্রকৃতি ও পরিবেশকে সংরক্ষণ ও যত্ন করার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। শিশু ও তরুণদের প্রকৃতির প্রতি সম্মান ও ভালোবাসা জাগানোর শিক্ষার কথা বলেছেন। আর উদাহরণ তুলে এনেছেন আদিবাসী জীবনধারার ও সংস্কৃতির, কিভাবে তারা প্রকৃতি, বন, পাহাড়, নদী ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করে বেঁচে থাকে। পোপ মহোদয় বলেছেন, "They teach us that we cannot heal the earth unless we love and respect it."

আমরা জানি, আদিবাসীদের কাছে ধরিত্রী, ভূমি পবিত্র। অনেক অআদিবাসী বলেন, শিক্ষা ও সচেতনতার অভাবে আদিবাসীরা জমির দলিল বা রেজিস্ট্রি করে না। কথাটি ঠিক নয়। আদিবাসীদের কাছে ভূমি দলিল করার বা মুনাফা করার বিষয় নয়। ভূমি ও বনের সঙ্গে আদিবাসীদের রয়েছে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক। ভূমি শুধু চাষবাস বা অর্থনৈতিক উপাদান নয়। ভূমি কেনাবেচার বস্তুও নয়। ভূমি আদিবাসীদের জীবনের অংশ, ল্যান্ড ইজ লাইফ। বলিভিয়ার প্রেসিডেন্ট ইভো মোরালেস আইমারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের। নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বিশ্ব নেতাদের সামনে তিনি ভাষণে বলেছেন, আমাদের কাছে ধরিত্রী হলো জননী, মাদার আর্থ। জননীকে আমরা কী করে কেনাবেচা করি? আমি এই সভায় উপস্থিত ছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে লতা মুঙ্গেশকরের গান শুনতাম। নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা বুঝিবা পথ ভুলে যায়/ কুলায় যেতে যেতে কী যেন কাকলী আমারে দিয়ে যেতে চায়/ দূর পাহাড়ে উদাস মেঘের দেশে/ওই গোধুলির রঙিন সোহাগ মেশে/বনের মর্মরে বাতাস চুপি চুপি কী বাঁশি ফেলে রাখে হায়। প্রকৃতির বন্দনা গানে। এখনো শুনি এই গান গাড়িতে গ্রামের পথে যেতে যেতে। আমার ডানপাশে গারো পাহাড় দিন দিন বিবর্ণ হয়ে যায়। সোমেশ্বরীসহ পাহাড়ের কোলে সব নদীর বুকে বালু-পাথরবাহী দানব ট্রাক চলে, পানি দূষিত হয়, বনের বৃক্ষ উজাড় হয়, নদীর মাছ মরে ভেসে ওঠে। অপরিনামদর্শী পরিবেশ বিধ্বংসী উন্নয়নের দিকে ধাবিত অর্বাচীন আত্মঘাতী মানুষ। কষ্টে, আবেগে চোখ ভিজে আসে। যতবার গ্রামে যাই, শৈশবের সংড়া গ্রামে নদীর দিকে তাকাই। মুমূর্ষু নদী, শক্তিহীন, অবসাদে ক্লান্ত। ছেলেবেলার কত স্মৃতি চোখে ভাসে। আদিবাসীরা বলতো, The rivers are our sisters. নদী হলো আমার বোন। পোপ মহোদয়ের কথায়, এই নদীরা এখন কাঁদে অবিরাম।

এখনো আমার গ্রামে সন্ধ্যায় আকাশে কিছু পাখি উড়ে যায়। মনের মধ্যে কত কথা জমে। আমাদের সন্তানেরা যেন হৃদয় দিয়ে শেখে মানুষ ও প্রকৃতি একাকার। অল ইজ কানেক্টেড। কেউ কাউকে পরাজিত করবে না। হারাবে না। উভয়ে উভয়কে সম্মান করবে ও ভালোবাসবে। আমাদের সন্তানেরা যেন শেখে, নদীর কাছে, ফসলের মাঠের কাছে, মেননেং-সীমসাং-বুগাই-ইছামতি-ব্রহ্মপুত্র নদীর কাছে, ধান খেত আর বাঁশ বাগানের কাছে, পায়ে চলা মেঠো পথের কাছে, নাম না জানা বুনো ফুল আর সুর তোলা পাখির কাছে, রঙিন প্রজাপতির কাছে, এই জন্মভূমির কাছে আমাদের কত ঋণ! আমরা যেন অনুভব করতে শিখি, এই ধরিত্রী আমার নয়, বরং আমিই ধরিত্রীর। ধরিত্রীর গান যেমন আমরা ভালোবাসি, ধরিত্রীর বেদনায় যেন আমরা অনুতাপে কাঁদতে পারি॥

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

লাতিন আমেরিকার সন্ন্যাসব্রতীদের আনন্দময় সাক্ষী হয়ে ওঠতে পোপ মহোদয়ের আহ্বান

গত ৯ আগস্ট লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের উৎসর্গীকৃত নারী-পুরুষেরা একটি অনলাইন কংগ্রেসে মিলিত হয়। লাতিন

আমেরিকার ধর্মব্রতীদের কনফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত ৩দিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয় 'একটি আন্তঃসংঘীয়, আন্তঃসাংস্কৃতিক ও এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বয়ে চলা ধর্মীয় জীবনের দিকে'।

সংস্কৃত্যায়ন ও মঙ্গলসমাচার: পোপ মহোদয়ের ভিডিও বার্তার মধ্যদিয়ে কনফারেন্সের শুরু হয়। তিনি তার বক্তব্যে মঙ্গলসমাচারের সংস্কৃত্যায়ন এবং আনন্দময় মুখাবয়ব রাখার ওপর জোর দেন। ঐশতত্ত্বে সংস্কৃত্যায়ন শব্দটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় খ্রিস্টীয় বিশ্বাস গ্রহণ এবং স্থানীয় সংস্কৃতিতে তা অনুশীলনের বিষয়টিকে বুঝাতে। পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন, উৎসর্গীকৃত সন্ন্যাসব্রতীদের বিশেষ কাজ হলো বিশ্বাসের সংস্কৃত্যায়ন ঘটানো। এটি আবিস্কার করা খুবই সুখকর যে, ঐক্য মানে অভিন্নতা নয় কিন্তু বহুমুখী সম্প্রীতি। আর এ ঐক্য আনয়নে পবিত্র আত্মাই প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

সুসমাচার প্রচারধর্মী সংস্কৃতি: যে ঐশতত্ত্ব স্থানীয় পরিস্থিতিগুলোকে আপন করে নেয় এবং সুসমাচার প্রচারের একটি বাহন হয়ে ওঠতে পারে; সন্ন্যাসব্রতী ভাই-বোনেরা সে ধর্মতত্ত্ব পালনে অন্যদেরকে সাহায্য করতে পারে। পোপ মহোদয় জোর দিয়ে বলেন, যে বিশ্বাস সংস্কৃতির মধ্যে প্রোথিত নয় তা খাঁটি নয়, আমরা যেনো তা কখনো না ভুলি। সন্ন্যাসব্রতীদের আহ্বান করেন, মানুষের রীতি-নীতি ও ঐতিহ্যকে সম্মান দেখিয়ে তাদের বিশ্বাসের জীবনে প্রবেশ করুন। আর এমনিভাবে সংস্কৃতিকেও সুসমাচারের মধ্যে নিয়ে আসুন। এ ধরণের সংস্কৃত্যায়ন যখন সংগঠিত না হয় তখন খ্রিস্টীয় জীবন অস্বাভাবিক ও হাস্যকর প্রবণতার সাথে শেষ হয়। উপাসনার অপব্যবহার এর একটি উদাহরণ হতে পারে। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীদের উদাত্ত আহ্বান করে পোপ ফ্রান্সিস বলেন, বিশ্বাসকে সংস্কৃত্যায়িত করো এবং সংস্কৃতিকে দীক্ষা দাও।

অতীতের সুখস্মৃতিকে কাটিয়ে ওঠা: উৎসর্গীকৃত জীবন মিলন স্থাপনে দক্ষতা দান কওে যেহেতু তা বহমান ধারা ও ভ্রাতৃত্বকে বৃদ্ধি করে। তথাপি ধর্মীয় সংঘগুলোর শুধুমাত্র সংখ্যা গণণা ও তাতে বেঁচে থাকার আশা পোষণ করার মনোভাব দেখে পোপ মহোদয় দুঃখ পান। ধর্মীয় সংঘগুলোর সংখ্যা ও দক্ষতার মানদণ্ড পরিত্যাগ করা একটি ভালো চিন্তা। তা না হলে ধর্মীয় সংঘগুলো ভীত সন্ত্রস্ত শিষ্যতে পরিণত হবে; যা অতীত স্মৃতির যন্ত্রণার ফাঁদে পড়ে থাকবে। আসলে অতীত স্মৃতি/নস্টালজিয়া ধর্মীয় জীবনে একটি কুহকিনী সঙ্গীত।

খ্রিস্টে আনন্দ: পোপ মহোদয় নস্টালজিয়াকে বাদ দিতে লাতিন আমেরিকার সন্ন্যাসব্রতীদেরকে 'আনন্দ' মূল্যবোধকে উপহার হিসেবে গ্রহণ করতে বলেন। ঈশ্বরের পবিত্রজন জনগণের সাথে থাকো, তাদের সম্মান করো, প্রচার করো এবং তাদের কাছে সাক্ষ্য দান করো। এসবের পরে বাদ বাকিটুকু পবিত্র আত্মার হাতে ন্যস্ত করো। আনন্দ খ্রিস্টের জীবনে সর্বোত্তম প্রকাশ এবং এর মধ্যদিয়ে আমরা সর্বোত্তম সাক্ষ্য দান করতে পারি। শান্তি এবং হাস্যরসের মনোভাবও এমন অনুগ্রহ যা আমাদেরকে আনন্দ দান করে।

জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে যুবদের নিয়ে পোপ মহোদয়ের আশাবাদ প্রকাশ

যুবকদের উপর পোপ ফ্রান্সিসের গভীর বিশ্বাস আছে, যারা যৌবনের চেতনায় বিশেষভাবে গরীব ও অভাবীদের পক্ষে অবস্থান নিয়ে একটি ন্যায্য ও পক্ষপাতহীন বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারবে। গত ৯ আগস্ট এক টুইটার বার্তায় পোপ ফ্রান্সিস বলেন, যুবকদের এবং তাদের সৃজনশীল উদ্ভাবনীর সহায়তা নিয়ে আমরা মানব জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, পানি, ঔষধ, পর্যাপ্ত কাজ নিয়ে দরিদ্রতমদের কাছে আমরা পৌঁছতে পারি। জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক যুব দিবসের এ বছরের মূলভাব নির্ধারণ করা হয়েছে: খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রতিবছর ১২ আগস্ট আন্তর্জাতিক যুব দিবস পালন করা হবে। যার শুরুটা ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। স্মারণিক এই দিবসটিতে যুব বিষয়ক ইস্যুগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নজরে আনা হয় এবং যুবকদের সক্ষমতাগুলো উদ্‌যাপন করা হয়। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘের যুবদিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো : খাদ্য ব্যবস্থার পরিবর্তন: মানবজাতি ও বিশ্ব স্বাস্থ্যের জন্য যুবদের উদ্ভাবন। যুবদের অংশগ্রহণ ছাড়া খাদ্য ব্যবস্থার যথার্থ পরিবর্তন সম্ভব নয়। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তনীয় গুতেরেস আন্তর্জাতিক যুব দিবসের বার্তায় বলেন, সকলের জন্য উত্তম ভবিষ্যত সৃষ্টির লক্ষ্যে যুবকেরা হলো সম্মুখ সারির যোদ্ধা। কোভিড-১৯ দেখিয়েছে কি ধরনের পরিবর্তন একান্ত দরকার। এই পরিবর্তনে যুবশ্রেণী সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা দিবে। অসীম সাহসী, সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় যুবসমাজ যুগ যুগ ধরে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তাই খাদ্য পরিবর্তন ব্যবস্থায় এবং কোভিড-১৯ সংক্রমণ উত্তরণসহ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংরক্ষণে যুবদের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

কাথলিক মণ্ডলীরও আলাদাভাবে বিশ্ব যুব দিবস রয়েছে; যা প্রতিবছর তালপত্র রবিবারে ধর্মপ্রদেশীয় ও স্থানীয়ভাবে বিশ্বব্যাপী পালন করা হয়। সাধু পোপ ২য় জন পলের উদ্যোগ ছিল এটি। তিনি প্রভু যিশু খ্রিস্টের ১৯৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৮৩/৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের বিশ্বাসী ভক্তদেরকে রোমে আসার নিমন্ত্রণ জানান। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩ লক্ষের অধিক যুবক পোপ মহোদয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে রোম নগরীর সাধু পিতরের চত্বরে মিলিত হন ঐ বছরের তালপত্র রবিবারে। পরের বছর ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক যুব দিবস ঘোষণা করে এবং আয়োজকরা ভাতিকানে অনুরূপ একটি র‍্যালী প্রত্যাশা করে। পোপ মহোদয়ের আহ্বানে আবারো ২.৫ লক্ষ যুবক ভাতিকানে মিলিত হয়। পরবর্তীতে পোপ মহোদয় ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে ২০ ডিসেম্বর বিশ্ব যুব দিবস প্রতিষ্ঠা করেন; যা প্রথমবার পালিত হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। এর পর থেকে প্রতি বছরই যুবদিবস পালিত হয় এবং প্রতি তিন বছর পর পর বিশ্ব যুব দিবস উদ্‌যাপিত পোপ মহোদয়ের ঘোষিত কোন নির্দিষ্ট দেশে॥

বৃক্ষের অবিরত কান্না

সংগ্রামী মানব

প্রকৃতি কথা বলে। নিশ্চয়ই প্রকৃতির বলি রয়েছে। সদা-সর্বদা সে যেন হাস্যোজ্জ্বল। আবার কখনও এর মাঝে অশুভ সংকেত প্রতিধ্বনিত হয়। এ যেন সদাই উদার মনোভাবাপন্ন। প্রকৃতির গাছ-পালা, নদী-নালা, আকাশ বাতাশে যেন শুধুই বিরহের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সবকিছু কেমন জানি থমকে গেছে। এ কেন বা কিভাবে জানতে চায় সত্যজিত চাকমা। তিনি পেশায় একজন সহকারী স্কুল শিক্ষক। সামাজিক বিজ্ঞান বিভাগের কথা না বললেই নয়। গুটি-দশেক পুরষ্কার পাওয়ার অভিজ্ঞতাও আছে তার। সত্যজিতের গ্রামের বাড়ি শ্যামনগরে। গ্রামটির সৌন্দর্য স্বর্গতুল্য। কোন কিছুরই কমতি নেই। চারদিক পাহাড় ঘেরা, মাঝ দিয়ে সুতক নদী বয়ে গেছে। গাছ-গাছালি চোখে পরার মত। আর এ যেন পশু-পাখির মিলন ক্ষেত্র। যা হোক, সত্যজিত চাকমা সপ্তাহ খানেক হয় গ্রামে এসেছে। জীবনের পঁচিশটি বছর কাঁটিয়েছে শহরে। বই পুস্তক পড়ে যতটুকু জ্ঞান আহরণ করেছে, গ্রাম-গঞ্জ সম্বন্ধে অতটুকুই ধারণা আছে। তা না হলে ও কি বলতে পারত, ঢেঁকি দিয়ে কি করে। সত্যজিতের খুবই বাসনা হল গ্রামটাকে পুঙ্খানো-পুঙ্খভাবে অভিজ্ঞতা করার। পরের দিন খুব সকালে সত্যজিত বেরিয়ে পড়ল। মেঠো রাস্তা ধরে, এপাশ-ওপাশ করে এগুতে লাগলো। রাস্তার দুপাশে সারি সারি গাছ, পক্ষীকুলের মধুর সঙ্গিতে প্রাণটা ভরে গেল। যেতে যেতে সে লক্ষ্য করল গাছ-গাছালির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সত্যিই শত-শত গাছের সমারহ। সত্যজিত এবার ধীরে-ধীরে হাঁটতে শুরু করল। কিছু পথ যাওয়ার পর একটি স্বর তার কানে ভেসে এল। এই যে ভাল মানুষ, একটু শুনবে! কে যেন তাকে ডাকছে। সে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ধমকে দাঁড়ালো। পুনরায় তাকে লক্ষ্য করে বলল, এই যে প্রকৃতিপ্রেমী মানুষ, একটু এদিকে আসবে! সত্যজিত জিজ্ঞেস করল, কে তুমি? উত্তরে বলল, আমি প্রতিবাদী বৃক্ষ। এই কথা শুনার পর সত্যজিত বুঝতে পারল তার সামনে থাকা গাছ থেকেই শব্দটি আসছে। সত্যজিত পুনরায় হাঁটা শুরু করল। গাছের একেবারে দারপ্রান্তে চলে এল। সে দেখতে পেল গ্রাছটি মৃতপ্রায়। দু-চারটি জটলা ও কিছু পাতা ছাড়া আর কিছুই নেই। শরীরে আছে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন। সত্যজিত বলল, তুমি কি আমায় ডেকেছ? প্রতিবাদী বৃক্ষ বলল, হ্যাঁ আমিই

তোমায় ডেকেছি। সত্যজিত একটু অবাক হল। গাছ ও দেখি মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। এটা কি করে সম্ভব। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল। পরক্ষণে সত্যজিত বলল, তুমি কিভাবে মানব ভাষা রপ্ত করেছ? আমায় বলবে প্লিজ! আরে সাহেব মানব ভাষা, এতো তোমাদের ভাষা, এই ভাষা রপ্ত করার কোন ইচ্ছাই আমার ছিল না। কিন্তু কি করব, তা আমায় শিখতেই হল। আমি আনন্দিত ছিলাম বলে মানব ভাষা শিখিনি বরং দুঃখ যন্ত্রণায় ভারাক্রান্ত হয়েই শিখেছি। তুমি আমার শরীরের দিকে একবার লক্ষ্য কর। কি দেখতে পাচ্ছ? প্রতিবাদী বৃক্ষ জিজ্ঞেস করল। সত্যজিত বলল, অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, দুঃখ-যন্ত্রনা। হ্যাঁ তুমি ঠিকই দেখছ। এ ক্ষতচিহ্নগুলো আমার যন্ত্রনা। প্রতিটি ক্ষত আমার একেকটি অঙ্গ হারিয়ে যাওয়ার ন্যায়। প্রকৃতিতে জন্মেছি, সেখানেই বেঁড়ে উঠছিলাম। আমার কি দোষ বলতো। ওরা কেন আমায় এত যন্ত্রনা দিল। সত্যজিত বলল, কারা আর কে তোমায় যন্ত্রনা দিয়েছে? প্রতিবাদী বৃক্ষ বলল, ঐ দেখা যায় ঐ অমানুষেরা। যখন নেওয়ার সময় তখন নিয়েছে আর যখন দেওয়ার সময় তখন দিয়েছে তবে খাদ্য নয় বরংয যন্ত্রনা। সেটা আমার বৃদ্ধির জন্যে নয় বরং আমাকে চিরতরে শেষ করে ফেলার জন্যে। ঐ দস্যুরা আমায় নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। আমার গায়ে দায়ের অসংখ্য কোপ বসিয়েছে। আমি চিৎকার করে কাঁদতে চেয়েছি, কেঁদেছি তবুও ওরা ক্ষান্ত হয়নি বরং অত্যাচার বৃদ্ধি করেছে। আমার এই মন-আর্তনাদগুলো জানাতেই আমি মানব ভাষা রপ্ত করেছি। আমি আর বাঁচতে চাই না, সত্যজিত। তোমার পাশের ঐ ঝোঁপঝাঁড়ে একটি কুড়োল পরে আছে, দস্যুরা ফেলে রেখে গেছে। সেটা নিয়ে এসে তুমি আমাকে দুখন্ড করে ফেল। সত্যজিত বলল, তুমি কষ্ট পেয়ো না বৃক্ষ বন্ধু। তোমার কষ্ট ওরা বুঝতে না পারলেও আমি বুঝেছি। ওদের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। প্লিজ আমাদের ক্ষমা করে দাও। আজ থেকে তোমার দেখ-ভালের দায়িত্ব আমার। আমি তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব। আজ থেকে আমি মানব আর তুমি বৃক্ষ, মানব-বৃক্ষ দুইজনে বন্ধু। সত্যজিতের কথায় প্রতিবাদী বৃক্ষ সন্তুষ্ট হল ও অবোধ, স্বার্থপর মানবদের ক্ষমা করে দিল॥

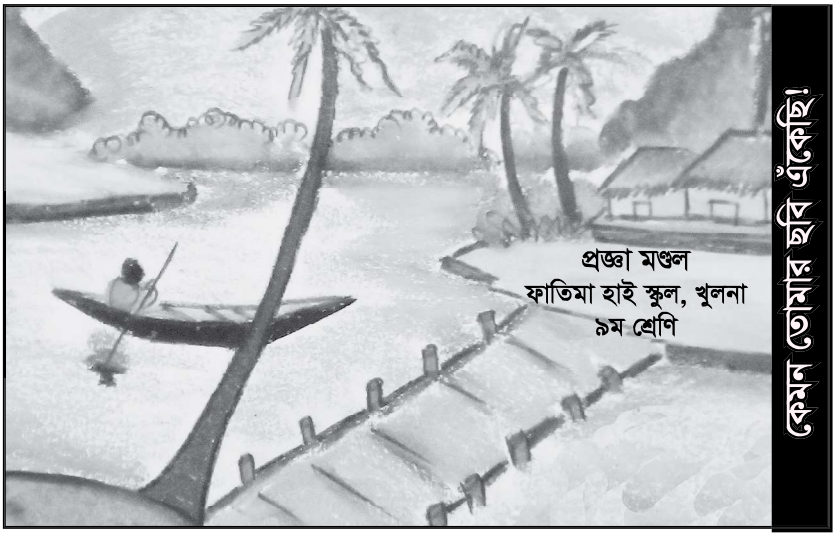

করোনা ভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ও দরিদ্র পরিবারে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান

ফাদার বাবলু সি. কোড়াইয়া ▯ গত ১ জুলাই থেকে দেশব্যাপী টানা লকডানে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লীর প্রায় ২,৪০০ পরিবারকে ১০০০ টাকা করে সর্বমোট ২,৪০০,০০০.০০ (চব্বিশ লক্ষ) টাকা নগদ বিতরণ করা হয়। এছাড়াও রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে কর্মরত স্থানীয় সিস্টার সম্প্রদায়ের সিস্টারদের এবং স্কুল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে মোট ৬,২০,০০০.০০(ছয় লক্ষ বিশ হাজার) টাকা সর্বমোট ৩,০২০,০০০.০০ (ত্রিশ লক্ষ বিশ হাজার) টাকা বিতরণ করা হয়। এই ত্রাণ কার্যক্রম সম্বন্ধে রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের বিশপ জেভার্স রোজারিও বলেন, কাথলিক মণ্ডলি সব সময়ই দরিদ্রদের পক্ষ সমর্থন করে থাকে। বর্তমান এ বাস্তবতায় দরিদ্র মানুষদের পক্ষ সমর্থন করা বা তাদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া আমাদের একটি নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করি। সেই সাথে এও মনে করি যে, এ কঠিন সময়ে সকলকেই নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী আর্তমানবতার সেবাকাজে এগিয়ে আসতে হবে। তাই, তিনি সমাজের বিত্তবানদেরকে এ কাজে এগিয়ে আসার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। কোভিড মহামারি চলাকালীন সময়ে সকলকে তিনি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার এবং নিরাপদে থাকার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, “প্রার্থনা করি যেন করোনা ভাইরাস থেকে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে মুক্ত ও নিরাপদ রাখেন। বিশেষভাবে করোনা ভাইরোসে আক্রান্ত জনগণের জন্য প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর তাদেরকেও এই চরম মূর্হুতে তাদের পাশে থাকেন এবং সকলকে আর্শীবাদ করেন।” - *সৌজন্যে বরেন্দ্র দূত*

তুইতাল ধর্মপল্লীতে সাধু জনমেরী ভিয়ান্নীর পর্ব উদ্‌যাপন

ডিকন জুয়েল ডমিনিক কস্তা ▯ গত ৪ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টাব্দে তুইতাল পবিত্র আত্মার ধর্মপল্লীতে পালন করা হয়েছে ধর্মপ্রদেশীয় যাজকদের আদর্শ প্রতিপালক সাধু জনমেরী ভিয়ান্নীর পর্ব। পর্বের পূর্বে আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিস্বরূপ তিন দিনের বিশেষ খ্রিস্টযাগের ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত তিন দিনের পুণ্য উপাসনায় পুরান তুইতাল, নতুন তুইতাল, ওয়াইসিএস, শিশুমঙ্গল দল, মারীয়া ভেলেঙ্কিনী সংঘ, - গান, পত্রপাঠ, আরতি, সার্বজনীন প্রার্থনা, অর্পন সামগ্রী বহন সহ অন্যান্য সবকিছু অতি সুন্দরভাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রস্তুতিমূলক প্রতিটি খ্রিস্টযাগেই পৌরহিত্য করেন উক্ত ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার পঙ্কজ প্লাসিড রড্রিকস।

পর্বীয় খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠিত হয় ৪ আগস্ট সকাল ৭ টায় এতে বিপুল সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের শুরুতে শিশুমঙ্গল, ওয়াইসিএস, আরতি কন্যা, সেবক-সেবিকাসহ ডিকন ও পাল-পুরোহিত গির্জার পিছন থেকে শোভাযাত্রা করে বেদীতে প্রবেশ করেন। পাল-পুরোহিত তার উপদেশে সাধু জনমেরী ভিয়ান্নীর সংগ্রামী জীবন, অধ্যবসায়, নম্রতা, বাধ্যতা, ধৈর্যশীলতা ও ভিয়ান্নীর আধ্যাত্মিকতার উপর অতি সুন্দর ও সহজ-সরলভাবে খ্রিস্টভক্তদের নিকট তুলে করেন। উক্ত পর্বদিবসে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিতকে সকল খ্রিস্টভক্ত, সিস্টার ও ডিকনের পক্ষ থেকে ফুল, কার্ড, গান ও বিভিন্ন উপহার সামগ্রীর মধ্যদিয়ে পর্বীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয়। সবশেষে পর্বীয় খ্রিস্টযাগে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ, সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ফাদার পংকজ প্লাসিড রড্রিকস প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন॥

এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)-এর উদ্যোগে অনলাইনে খ্রিস্টযাগ আয়োজন

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ▯ বাংলাদেশের কাথলিক খ্রিস্টান চিকিৎসক ও মেডিকেল শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)'- এর উদ্যেগে গত ৩০ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে অনলাইন খ্রিস্টযাগের আয়োজন করা হয়। করোনা মহামারির কারণে এবিসিডি-র সদস্য ক্যাথলিক চিকিৎসক ও মেডিকেল/ডেন্টাল শিক্ষার্থীগণ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম জুম এর মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস কস্তা। চিকিৎসক ও শিক্ষার্থীরা ছাড়াও এতে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী (সিবিসিবি) এর সেক্রেটারি ও ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত জাতীয় এপিসকপাল কমিশনের সাধারণ সম্পাদিকা মিসেস লিলি গমেজ ও বাংলাদেশ ক্যাথলিক নার্সেস গিল্ড (বিসিএনজি) এর সভাপতি, সা. সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যরা। খ্রিস্টযাগ পরবর্তী আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে এখন থেকে প্রতি মাসের শেষ শুক্রবারে রাত ৮টায় এবিসিডি ও বিসিএনজি-এর সদস্যরা এক সাথে খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবেন। এ সময় আরো আলোচনা করা হয় কীভাবে এই দুই ক্যাথলিক সংগঠন একে অপরের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে নিজেদের কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে পারে। সবশেষে এবিসিডি- এর সভাপতি ডা. এডুওয়ার্ড পল্লব রোজারিও খ্রিস্টযাগ ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করেন॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

প্রয়াত লেখক নিধন ডি' রোজারিও'র লেখা সংগ্রহ প্রসঙ্গে

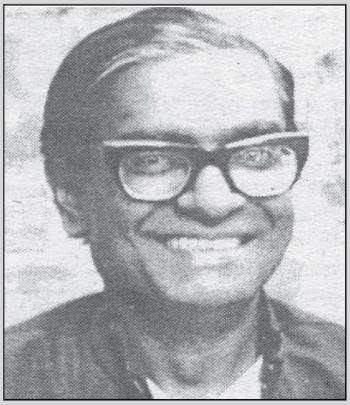

সম্মানিত সুধী,

প্রয়াত লেখক নিধন ডি' রোজারিও'র পরিবারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই শ্রদ্ধা ও নমস্কার!

আমাদের বাবা বাংলাদেশখ্রিষ্ট মণ্ডলীতে একজন সুপরিচিত লেখক ছিলেন। তিনি লিখেছেন নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, বাইবেল ভিত্তিক রচনা যার বেশ কিছু প্রতিবেশী প্রকাশনী হতে বই আকারে বা সাপ্তাহিক প্রতিবেশীতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তিনি অনেক গান রচনা করেছেন যা গীতাবলীতে গ্রন্থিত আছে। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় কিছু সংগঠন যেমন - সুহৃদ সংঘ, জাগৃতি সংঘের জন্যও গান, নাটক, ইত্যাদি রচনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি তৎকালীন কয়েকটি প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা - দৈনিক জেহাদ, দৈনিক ইত্তেহাদ, দৈনিক আজাদ, সাপ্তাহিক জনতা, মাসিক দিলরুবা, মাসিক সওগাতসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকাতে লিখেছেন।

বর্তমানে আমরা পরিবারের পক্ষ থেকে 'নিধন রচনাবলী' প্রকাশের উদ্যোগ হাতে নিয়েছি। কিন্তু আমাদের বাবার রচিত সকল লেখার পাণ্ডুলিপি আমাদের হাতে নেই। অতীতে কেউ কেউ 'নিধন রচনাসমগ্র' প্রকাশনার উদ্যোগ নেবার প্রতিশ্রুতি দেয়ায় তাদের হাতে বাবার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লেখা তুলে দেয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে জানা যায় তা উঁই পোকার আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর মাধ্যমে আপনাদের কাছে সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি যদি কারো সংগ্রহে আমাদের বাবা প্রয়াত নিধন ডি' রোজারিও'র কোন প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত লেখা (নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, গান, জার্নাল), তার লেখা চিঠি বা নোট, তাঁর ছবি থেকে থাকে তবে তা দয়া করে আমাদের অবগত করবেন। আমরা তা আপনার কাছ থেকে সংগ্রহ করে কাজ শেষ হবার পর তা ফেরত দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। ছবি তুলেও তা শেয়ার করতে পারেন। যারা এই বিষয়ে সহযোগিতা করবেন তাদের প্রতি আমরা চির কৃতজ্ঞ থাকবো এবং নিধন রচনাবলীতে তাদের নাম প্রকাশের মাধ্যমে আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগটি নেব। আপনাদের মূল্যবান পরামর্শও আমরা সাদরে গ্রহণ করবো।

এই সংক্রান্ত যে কোন তথ্য প্রেরণের জন্য নিম্নোক্ত ফোন ও ই-মেইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি।

প্রয়াত লেখক নিধন ডি' রোজারিও'র পরিবারের পক্ষে,

শিবা মেরী ডি' রোজারিও
যোগাযোগঃ
ফোনঃ ০১৭১৩৩৮৪০১৩ (শিবা); ০১৭১৩২৫৬৮৭২ (তপন)
ই-মেইলঃ shibarozario@gmail.com; taponrod@gmail.com

স্বর্গধামে ১৫তম বছর

প্রয়াত বেঞ্জামিন গমেজ
জন্ম : ২ ডিসেম্বর ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ

"তুমি দিয়েছিলে,
তুমি নিয়েছো প্রভু
ধন্য তোমার নাম,
তোমার পৃথিবী;
তোমারই,
স্বর্গ পূণ্য সকল ধাম।"

সময়ের আবর্তে পূর্ণ হতে চলেছে বাবার মৃত্যুর পনেরো বছর। আজও আমরা এ দিনটিকে শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি প্রদান করেন।

স্বর্গধামে ১ম বছর

প্রয়াত লুইজা রেখা গমেজ
জন্ম : ৭ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

দেখতে দেখতে একটি বছর পার হয়ে গেল, মা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো পিতার রাজ্যে। তোমার অভাব কোন কিছুতেই পূরণ হবার নয়। পরম করুণাময় পিতা ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্ত শান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে
পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/২১৩/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 29
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ২৯
Regd. No. DA-33
❖ 15 - 21 August , 2021, ৩১ শ্রাবণ - ৬ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

HAGGAI INSTITUTE™ BANGLADESH

Virtual National Seminar 2021 by HIAAB (Sept. 24- Oct. 16, 2021)

Haggai Institute Alumin Association Bangladesh (HIAAB) will conducta 08-Day long Virtual National Seminar (VNS 2021) from September 24, 2021 till October 16, 2021. **The seminar sessions would be held on the weekends i.e., every Fridays and Saturdays from 5:00 PM to 10:00 PM.**

- This training seminar is a miniature version of Haggai International Training. Haggai International training covers about 14-15 subjects while the Virtual National Seminar covers 7-8 subjects. Certificate of participation will be awarded on the closing day.
- Criteria for the selection are:
  1) Both male/female , not less than 25 years of age;
  2) Education: M inimum a bachelor degree;
  3) Church affiliation is a must;
  4) Must attend full 8-day program on time;
  5) Desire to work for His Kingdom.
- Seat will be allotted on first -come-first -serve basis if crite ria are fulfilled & seat is still vacant.
- National and International faculties are facilitators of the program.
- Weekend training sessions start at 5:00 PM and closes at 10:00 PM.
- Registration fee is Tk 1,530 (including the Bkash charge) per person. Any Christian organization/NGO can send group participants. Registration closes by September 07, 2021.
- For VNS-2021 registration and to obtain the VNS-2021 Application Form please contact:
  1) Marshia Mili Gomes- Mobile: +8801715100147, Email: marshiamili@yahoo.com
  2) Dr Edward Pallab Rozario - Mobile: +8801730082241, Email: hiaabgs2020@gmail.com
  3) Isaac Rana Bonik - Mobile: +8801731578137, Email: isaacbonik@gmail.com
  4) Aporna Sarkar -Mobile: +8801748094105, Email: apornasarkar@yahoo.com
  5) Bartha Giti Baroi - Mobile: +8801980008541, Email: bgbaroi@gmail.com
- Payment Information: Please pay your participation fee by BKash (+8801715822089).

Marshia Mili Gomes
President
HIAAB
Mobile: +8801715100147
Email: marshiamili@yahoo.com

Isaac Rana Bonik
General Secretary
HIAAB
Mobile: +8801731578137
Email: isaacbonik@gmail.com

বিজ্ঞা/২১১/২১

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org